বিশ্বের শীর্ষ দশ পর্যটন গন্তব্যের দেশ ইরান

সাইদুল ইসলাম

গত ২৭ সেপ্টেম্বর ছিল বিশ্ব পর্যটন দিবস। এ উপলক্ষে বিশেষ অনুষ্ঠানমালার আয়োজন করে ইউনেস্কো ঘোষিত বিশ্বের শীর্ষ দশ পর্যটন গন্তব্যের দেশ ইরান। এজন্য ইরানের ৫টি প্রদেশকে নির্বাচন করা হয়। সমৃদ্ধ ও ঐতিহ্যবাহী ভ্রমণ গন্তব্যের প্রতিনিধিত্ব করায় এসব প্রদেশকে বাছাই করা হয়। প্রদেশগুলো হলো আরদেবিল, কোরদেস্তান, কেরমানশাহ, কেরমান ও ফার্স প্রদেশ। এসব প্রদেশে ছয় দিনব্যাপী চলে বিশ্ব পর্যটন দিবসের অনুষ্ঠান। বিগত দুই বছর ধরে ইরানের সাংস্কৃতিক ঐতিহ্য, পর্যটন ও হস্তশিল্প মন্ত্রণালয় দেশের কম পরিচিত পর্যটন গন্তব্যগুলোকে পরিচয় করাতে এবং স্থানীয় কর্তৃপক্ষ ও মানুষকে পর্যটনের গুরুত্বের প্রতি মনোযোগ আকৃষ্ট করতে বিশ্ব পর্যটন দিবসের মতো গুরুত্বপূর্ণ ইভেন্টকে কাজে লাগাতে বিশেষভাবে উদ্যোগী হয়েছে।

মানব সভ্যতার সুপ্রাচীন ঐতিহ্য ও সৌন্দর্যের অন্যতম লীলাভূমি আজকের ইসলামি প্রজাতন্ত্র ইরান। বিচিত্র প্রকৃতির বিপুল সম্ভারে পরিপূর্ণ এই দেশটি স্মরণাতীতকাল ধরে পর্যটকদের দৃষ্টি আকর্ষণ করে আসছে। প্রায় সব ধরনের পর্যটককে কোনো না কোনোভাবে আকৃষ্ট করতে সক্ষম ইরান। আপনি যদি সংস্কৃতির প্রতি আগ্রহী হয়ে থাকেন তাহলে ইরান আপনার জন্য হবে স্বর্গ। আপনি যদি শিল্পে আগ্রহী হন তাহলে এখানকার মনোমুগ্ধকর স্থাপত্য ও জাদুঘর আপনাকে দেবে পরমানন্দ। আর প্রকৃতিপ্রেমী হলে তো কথাই নেই। আপনি উপভোগ করবেন সেরা সব প্রাকৃতিক সৌন্দর্য।

সুপ্রাচীনকাল থেকে আজকের আধুনিক বিশ্ব; ইতিহাসের প্রতিটি বাঁকে ইরানের নাম অঙ্গাঙ্গিভাবে জড়িত। দেশটির ঐতিহাসিক দর্শনীয় স্থান, পৌরাণিক কাহিনী, আখ্যান যেকোনো পর্যটককে মুগ্ধ করে।

ইউনেসকোর বিশ্ব ঐতিহ্যের স্বীকৃতি প্রাপ্ত ট্রান্স-ইরানিয়ান রেলপথ

ফলে ইরানকে সবচেয়ে আকর্ষণীয় পর্যটনগন্তব্য হিসেবে বেছে নেয়াটা একেবারেই যৌক্তিক একটা সিদ্ধান্ত হবে তাতে কোনো সন্দেহ নেই। উত্তর-পূর্ব শিরাজ প্রদেশের অসাধারণ প্রাচীন শহর পারসেপোলিস থেকে শুরু করে প্রাচীন মানব-বসতিসহ ইরানের সব দর্শনীয় স্থান দেখে বিস্মিত হবেন আপনি। ইসফাহানে দেখবেন অর্ধ-জাহানের সৌন্দর্য! বিস্ময়ের সে ঘোর হয়তো কাটবে প্রকৃতির উজাড় করে দেওয়া ভালোবাসায়। প্রকৃতির এমন ভালোবাসা পাবেন গিলান কিংবা মাযান্দারান প্রদেশে।

প্রাকৃতিক পরিবেশের দিক থেকে বলতে গেলে ইরানে যেমন রয়েছে পাহাড় আর সাগর, তেমনি রয়েছে বিশাল মরুভূমি, কোথাও নদ-নদী, আবার কোথাও সুবিস্তৃত সমতলভূমি। ইরানের দুই পাশে রয়েছে দুই সাগর অর্থাৎ পারস্য উপসাগর ও কাস্পিয়ান সাগর। ভূমি-বৈচিত্র্যের মতো এখানকার আবহাওয়াতেও রয়েছে বেশ বৈচিত্র্য। সারা ইরানে বসন্ত, গ্রীষ্ম, শরৎ ও শীত– এই চারটি ঋতু রয়েছে। রাজধানী তেহরানসহ বিশাল এলাকাজুড়ে যখন প্রচণ্ড শীত কিংবা তুষারাবৃত তখন দক্ষিণে (পারস্য উপসাগর সংলগ্ন) দিব্যি বসন্তের হাওয়া। আপনি কম খরচে অভ্যন্তরীণ বিমানের কোনো ফ্লাইট ধরে সেখান থেকে সহজেই একটু উষ্ণতা নিতে পারেন। পাহাড়, সাগর, নদ-নদী আর জঙ্গলাকীর্ণ বৈচিত্র্যময় ভূমি এবং আবহাওয়ার কারণে ইরানে পর্যটকের ভিড়ও লেগে থাকে সারা বছর। এশিয়ার বহু দেশ, ইউরোপ ও উত্তর আমেরিকা থেকেই আসেন বেশি পর্যটক।

ইরানের ৩০টি বাঁধ পর্যটন গন্তব্যে পরিণত হচ্ছে

ইরানের অপরূপ সুন্দর 'কীশ' দ্বীপ

ইউনেস্কোর হিসাব মতে, ইরান বিশ্বের ১০ম প্রধান পর্যটনের দেশ। কেবল ইউনেস্কোর বিশ্ব ঐতিহ্যের তালিকাভুক্ত স্থান রয়েছে ২৬টি। এই তালিকা ক্রমেই দীর্ঘ হচ্ছে। গত ২৭ জুলাই ইরানের উরামানাত সাংস্কৃতিক ভূদৃশ্যকে বিশ্ব ঐতিহ্যবাহী স্থানসমূহের তালিকায় যুক্ত করেছে জাতিসংঘের শিক্ষা, বিজ্ঞান ও সংস্কৃতি সংস্থা ইউনেসকো। ১ লাখ ৬ হাজার হেক্টর ভূখণ্ডের উরামানাতে কয়েকশ গ্রাম রয়েছে। এর চারপাশ ঘিরে রয়েছে আরও ৩ লাখ ৩ হাজার হেক্টরের দৃষ্টিনন্দন সম্পত্তি। চীনের ফুঝুতে ইউনেসকোর বিশ্ব ঐতিহ্য কমিটির ৪৪তম অধিবেশনে স্থানটিকে বিশ্ব ঐতিহ্যবাহী স্থান হিসেবে স্বীকৃতি দেওয়া হয়।

সারভাবাদ কাউন্টির ঢালে ছড়িয়ে থাকা উরামানাত ভূদৃশ্যের কিছু অংশ কোরদেস্তান ও কিছু অংশ কেরমানশাহ প্রদেশে পড়েছে। এখানকার সারি সারি ঘরগুলো এমনভাবে তৈরি করা হয়েছে যার নিচের ঘরের ছাদ উপরের ঘরের আঙ্গিনা হিসেবে ব্যবহৃত হয়। বসতিটির অসাধারণ এই বৈশিষ্ট্য দারুণ আকর্ষণ তৈরি করেছে। একই মাসে এক হাজার চারশ কিলোমিটার দীর্ঘ ট্রান্স-ইরানিয়ান রেলপথকেও জাতিসংঘের শিক্ষা, বিজ্ঞান ও সাংস্কৃতিক সংস্থার (ইউনেসকো) বিশ্ব ঐতিহ্যবাহী স্থান হিসেবে ঘোষণা দেওয়া হয়েছে। ইউনেসকোর বিশ্ব ঐতিহ্য কমিটির ৪৪তম অধিবেশনে রেলপথটিকে বিশ্ব ঐতিহ্যবাহী স্থান হিসেবে স্বীকৃতি দেওয়া হয়। চীনের ফুঝুতে এই অধিবেশন চলে ৩১ জুলাই পর্যন্ত।

রেলপথটি ইরানের ব্যাপক উন্নয়নের ক্ষেত্রে একটি টার্নিং পয়েন্ট হিসেবে উল্লেখ করা যেতে পারে। এসব উন্নয়নের মধ্যে রয়েছে বিভিন্ন অর্থনৈতিক, বাণিজ্যিক, সামাজিক, সাংস্কৃতিক উন্নয়ন। এমনকি সমসাময়িক বিশ্ব ইতিহাসের স্পর্শকাতর ও গুরুত্বপূর্ণ সময়ের রাজনৈতিক দিকও এর অন্তর্ভুক্ত রয়েছে। ১৩৯৪ কিলোমিটার দীর্ঘ ট্রান্স-ইরানি রেলপথের চওড়া ১৪৩৫ মি.মিটার। রুটটিতে মোট ৯০টি ওয়ার্কিং স্টেশন আছে। কাস্পিয়ান সাগরের দক্ষিণপূর্বে অবস্থিত তোরকামান বন্দরের উত্তর পয়েন্ট থেকে রেলপথটি শুরু হয়েছে। সারি ও কায়েম-শাহর শহর হয়ে রেলপথটি আলবোর্জ অঞ্চলের পর্বত এলাকায় প্রবেশ করেছে। অনেকগুলো সেতু ও সুড়ঙ্গ বেয়ে তেহরান ও ভারামিন প্লেইনকে সংযুক্ত করেছে ঐতিহাসিক এই রেলপথটি।

ইরানের প্রাচীনতম শহর কাশান

দেশটিতে রয়েছে অসংখ্য বাগান। যেগুলো পরিদর্শনে যেকোনো পর্যটকের মন সত্যি ছুঁয়ে যাবে। এ পর্যন্ত দেশটির ৯টি বাগান বিশ্ব ঐতিহ্য তালিকায় অন্তর্ভুক্ত হয়েছে। ইউনেস্কোর প্রতিবেদনে ইরানের বাগিচাগুলো সম্পর্কে বলা হয়েছে, 'এই বাগিচাগুলোর ডিজাইন চারটি আলাদা আলাদা ভাগে বিভক্ত। এগুলোর মাঝখানে রয়েছে পানির ব্যবস্থা যা একদিকে দৃশ্য নির্মাণে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখছে অপরদিকে বাগানের সজ্জাকৌশল ও স্থাপত্যশৈলীর দিক থেকেও এই পানির ভূমিকা গুরুত্বপূর্ণ।' ওই প্রতিবেদনে আরো বলা হয়েছে, ইরানের বাগিচাগুলো কাল্পনিকভাবে বেহেশতের বাগানের অনুসরণে তৈরি করা হয়েছে। এই বিষয়টির প্রতি ইঙ্গিত করে বলা হয়েছে, ইরানের বাগিচা নির্মাণ পদ্ধতি ও সজ্জা কৌশলের প্রভাব সুস্পষ্টভাবে ভারত এবং স্পেনের মতো দেশগুলোর বাগিচা তৈরির স্টাইলের ওপর ব্যাপকভাবে পড়েছে। ইউনেস্কো তালিকাভুক্ত ইরানের নয়টি বাগিচা হলো : বাগে পাসারগাড, বাগে এরাম, বাগে চেহেল সুতুন, বাগে ফিন, বাগে আব্বাসাবাদ, বাগে শাযদেহ মহন, বাগে দৌলাতাবাদ, বাগে পাহলাভনপুর এবং বাগে আকবারিয়া। মজার ব্যাপার হলো, এইসব বাগিচা ইরানের বিভিন্ন অঞ্চলে বিচিত্র আবহাওয়াময় পরিবেশে নির্মাণ করা হয়েছে।

ইরানের উরামানাত সাংস্কৃতিক ভূদৃশ্য এখন বিশ্ব ঐতিহ্য

ইরানের হরমুজ গানের দৃষ্টিনন্দন প্রকৃতিরাজ্য

তবে ইউনেস্কোর বিশেষজ্ঞগণ স্বীকার করেছেন, অঞ্চলগত বৈচিত্র্য, পরিকল্পনা ও ডিজাইন এবং ইরানের ঐতিহাসিক রীতি ও সাংস্কৃতিক শেকড়গুলো এই মনোনয়নের ক্ষেত্রে যে কাজ করেনি তা নয়। এই বাগিচাগুলো ইতিহাসের বিভিন্ন যুগে গড়ে উঠেছে। সেই হাখামানশী যুগ অর্থাৎ খ্রিস্টপূর্ব অষ্টম শতাব্দী থেকে দুই শতাব্দী আগের কাজার শাসনামল পর্যন্ত সময়কালের মধ্যে বাগিচাগুলো তৈরি করা হয়েছে। ইরানিদের বিশ্বাস ও মূল্যবোধের মাঝে বাগিচা সবসময়ই একটি পবিত্র স্থান হিসেবে সম্মানিত ও মর্যাদাময়।

২০১৮ সালে বিশ্বের দ্বিতীয় দ্রুত বর্ধনশীল পর্যটন গন্তব্য হিসেবে ইরানকে স্বীকৃতি দিয়েছে বিশ্ব পর্যটন সংস্থা ইউনাইটেড নেশনস ওয়ার্ল্ড ট্যুরিজম অর্গানাইজেশন (ইউএনডব্লিউটিও)। ২০১৮ সালের ইউএনডব্লিউটিও-এর বার্ষিক প্রতিবেদন মতে, মিসর, নেপাল, জর্জিয়া এবং দক্ষিণ কোরিয়ার মতো দেশকে পেছনে ফেলে দ্বিতীয় স্থান অর্জন করে ইরান। অন্যদিকে, দ্রুত বর্ধনশীল পর্যটন গন্তব্য হিসেবে প্রথম স্থান অর্জন করেছে ইকুয়েডর। প্রতিবেদনে বিশ্বের যেসব দেশের পর্যটন প্রবৃদ্ধি সর্বাপেক্ষা বেশি সেসব দেশের পর্যটন সংশ্লিষ্ট বিভিন্ন বিষয় তুলে আনা হয়। র‍্যাঙ্কিংয়ে ইরানের পরে রয়েছে মিসরের অবস্থান।

ইরানে বাজার, জাদুঘর, মসজিদ, সেতু, বাথহাউস, মাদ্রাসা, মাজার, গির্জা, টাওয়ার এবং ম্যানসিসের মতো শত শত ঐতিহাসিক স্থান রয়েছে যা বিদেশী পর্যটকদের নিকট বেশ প্রিয়। ২০১৯ সালের ট্র্যাভেল রিস্ক ম্যাপে 'ইনসিগনিফিকেন্ট' ক্যাটাগরিতে স্থান পায় ইরান। এই বিভাগের দেশটির সাথে আরও রয়েছে যুক্তরাজ্য, ডেনমার্ক, সুইজারল্যান্ড, নরওয়ে এবং ফিনল্যান্ড। ট্র্যাভেল রিস্ক ম্যাপে পর্যটন গন্তব্যের দিক দিয়ে ঝুঁকিপূর্ণ দেশগুলোর ঝুঁকির মাত্রা বিশ্লেষণ করে র‍্যাঙ্কিং প্রকাশ করা হয়।

বিশ্বের অনন্য এক প্রাকৃতিক নিদর্শন হামেদানের আলিসাদ্‌র গুহা

মেডিক্যাল ট্যুরিজমেও ইরান ঈর্ষণীয় সাফল্য অর্জন করেছে। এখন সারা বছরই বিশ্বের বিভিন্ন দেশ থেকে বহু মানুষ ইরানে আসছেন চিকিৎসার জন্য। বেশিরভাগ রোগী হলেন ব্রিটেন, সুইডেনসহ পারস্য উপসাগরীয় দেশগুলোর। ইরানের স্বাস্থ্য মন্ত্রণালয়ের স্বাস্থ্য নীতিতে চিকিৎসা ব্যয় কমানোর ওপর গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে। এ কারণে ইরানে যেকোনো অপারেশনের ব্যয় তুরস্ক, ব্রিটেন এবং মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের এক চতুর্থাংশের মতো। তবে গুণগত দিক থেকে এখানকার চিকিৎসা বিশ্বমানের। সেজন্যই বিদেশী রোগীরা ইরানের চিকিৎসার মানের ব্যাপারে সন্তুষ্ট। এছাড়া ইরানি অস্ত্রোপচারকারী চিকিৎসক এবং সাধারণ চিকিৎসকগণ বেশ দক্ষ। বিদেশি সহযোগীরা

ইসলামি পর্যটন বিকাশে প্রস্তুত ইরানের ফার্স প্রদেশ

সবসময়ই তাঁদের প্রশংসায় পঞ্চমুখ। এশিয়ার দেশগুলোর মাঝে মেডিক্যাল ট্যুরিজমের ক্ষেত্রে কঠোর প্রতিযোগিতা চলছে। এই প্রতিযোগিতায় ইরানের অবস্থান বিশ্বের শ্রেষ্ঠ দশটি দেশের মধ্যে রয়েছে। ইরানের স্বাস্থ্য মন্ত্রণালয় মেডিক্যাল ট্যুরিজমের ক্ষেত্রে এশীয় দেশগুলোর সাথে সহযোগিতা বৃদ্ধি সংক্রান্ত আন্তর্জাতিক সমঝোতা স্মারকে স্বাক্ষরও করেছে। ইরানে বর্তমানে অন্তত ষাটটি হার্ট অপারেশন কেন্দ্রে ওপেন হার্ট সার্জারি হচ্ছে। ইরানের এই চিকিৎসা সেবা বিশ্বের চিকিৎসকগণকে আকৃষ্ট করছে। কেবল ওপেন হার্ট সার্জারিই নয়, আরো বহু জটিল ও মারাত্মক রোগের চিকিৎসা এখন বেশ উন্নত প্রযুক্তির মাধ্যমে করা হচ্ছে। ইরানের স্বাস্থ্যসেবা খাতে প্রায় ৪শ হাসপাতাল চিকিৎসা সেবা দিচ্ছে। যে বিষয়গুলো দেশটিতে পর্যটকদের বিশেষভাবে আকৃষ্ট করে তা হলো ইরানিদের আতিথেয়তা, থাকা-খাওয়ায় স্বল্প ব্যয়, সহজ ও উন্নত যাতায়াত ব্যবস্থা, অভিজাত ও ঐতিহ্যবাহী হোটেল, এক ভ্রমণে সব মৌসুমের অভিজ্ঞতা লাভের সুযোগ ও লোভনীয় বিভিন্ন খাবারের স্বাদ। সব মিলিয়ে ইরান ভ্রমণপিপাসুদের জন্য হয়ে উঠেছে অন্যরকম এক আকর্ষণের স্থান। '২০২৫ ট্যুরিজম ভিশন প্ল্যান' অনুযায়ী, ইরান ২০২৫ সাল নাগাদ ২ কোটি বিদেশী পর্যটক আকৃষ্টের লক্ষ্যমাত্রা নির্ধারণ করেছে। ২০১৪ সালে যেখানে দেশটিতে বিদেশী পর্যটক আগমনের সংখ্যা ছিল ৪৮ লাখ।

চলতি সালে খেলাধুলায় ইরানের সাফল্য

সাইদুল ইসলাম

খেলাধুলা মানুষের জীবনের একটি অবিচ্ছেদ্য অংশ। শিশুর শারীরিক ও মানসিক বিকাশে খেলাধুলার বিকল্প নেই। এটি মানুষের সুস্থ বিনোদনের অন্যতম প্রধান মাধ্যম। বর্তমানে বিশ্বের দেশে দেশে পারস্পরিক বন্ধুত্ব ও সৌহার্দ্যপূর্ণ সম্পর্ক গড়ে তোলার ক্ষেত্রে খেলাধুলার ভূমিকা অনস্বীকার্য হয়ে উঠেছে। সেজন্য খেলাধুলার আন্তর্জাতিক ভূমিকাও কম গুরুত্বপূর্ণ নয়।

খেলাধুলা দেহ-মনে স্বাচ্ছন্দ্য ও প্রশান্তি বয়ে আনে। পরিচ্ছন্ন বিনোদন ও খেলাধুলার মধ্য দিয়ে যে শিশু বেড়ে ওঠে তার পক্ষে সফল মানুষ হিসেবে গড়ে ওঠা সম্ভব। আবার অপরিচ্ছন্ন বা কুয়াশাচ্ছন্ন বিনোদনে বেড়ে ওঠা শিশুর জীবন ধ্বংস হতে বাধ্য। এ কারণে বলা হয়, শিশু বয়সে মানুষ যা গ্রহণ করে পরবর্তী জীবনে সে তা লালন করে। তাইতো ইসলামি প্রজাতন্ত্র ইরান জ্ঞানচর্চার পাশাপাশি মানুষের সুস্থ বিনোদনের অন্যতম প্রধান মাধ্যম হিসেবে খেলাধুলাকে বিশেষভাবে গুরুত্ব দিয়ে থাকে। সরকারের পৃষ্ঠপোষকতার পাশাপাশি জনগণের ব্যাপক আগ্রহের কারণে খেলাধুলায় ইরানের খ্যাতি আজ বিশ্বজোড়া। ফুটবল থেকে শুরু করে খেলাধুলার প্রায় সকল ক্ষেত্রেই অসাধারণ নৈপুণ্য দেখিয়ে চলেছেন ইরানি খেলোয়াড়রা।

এরই মধ্যে এশিয়ান পুরুষ ভলিবল চ্যাম্পিয়নশিপ ২০২১ এর শিরোপা জয় করেছে ইরানের জাতীয় পুরুষ ভলিবল দল। গত ১৯ সেপ্টেম্বর ফাইনাল ম্যাচে স্বাগতিক জাপানকে ৩-০ সেটে হারিয়ে চ্যাম্পিয়ন হওয়ার গৌরব অর্জন করে ইরানি স্কোয়াড। ইরান প্রতিপক্ষকে ২৭-২৫, ২৫-২২, ৩১-২৯ পয়েন্টের ব্যবধানে টানা তিন সেটে পরাজিত করে।

২১তম এশিয়ান সিনিয়র পুরুষ ভলিবল চ্যাম্পিয়নশিপ ১২ থেকে ১৯ সেপ্টেম্বর জাপানের চিবাতে অনুষ্ঠিত হয়। প্রতিযোগিতা শেষে ইরানি কোচ বেহরুজ আতায়েই এশিয়ার সেরা কোচ হিসেবে পরিচিতি লাভ করেন। অন্যদিকে ইরানি খেলোয়াড় সাবের কাজেমি সর্বাপেক্ষা মূল্যবান খেলোয়াড়ের উপাধি লাভ করেন।

এশিয়ান চ্যাম্পিয়নশিপে এ নিয়ে ইরান চারবার শিরোপা জিতল। অন্যদিকে স্বাগতিক জাপান এপর্যন্ত নয়বার চ্যাম্পিয়ন হওয়ার গৌরব অর্জন করে। ফাইনাল লড়াইয়ের মধ্য দিয়ে ইরান ও জাপান উভয়েই ২০২২ এফআইভিবি ভলিবল পুরুষ বিশ্ব চ্যাম্পিয়নশিপের টিকিট লাভ করে।

এদিকে, এশিয়ান পুরুষ ভলিবল চ্যাম্পিয়নশিপ ২০২১ এর শিরোপা জয়ের মধ্য দিয়ে এফআইভিবি বিশ্ব র‍্যাংঙ্কিংয়ে এশিয়ার সেরা ভলিবল দলের স্থান দখল করেছে ইরান। বিশ্বে ইরানের জাতীয় ভলিবল দলের স্থান দশম। এই তালিকায় জাপানের থেকে এক ধাপ এগিয়ে রয়েছে ইরানিরা। এফআইভিবি বিশ্ব র‍্যাংঙ্কিংয়ে শীর্ষে রয়েছে ব্রাজিল। এরপর রয়েছে যথাক্রমে পোল্যান্ড, রাশিয়া, ফ্রান্স ও ইতালি।

অলিম্পিকে ইরানের সাফল্য

'গ্রেটেস্ট শো অন দি আর্থ' খ্যাত অলিম্পিকের সর্বশেষ আসরেও ইরানের সাফল্য চোখে পড়ার মতো। জাপানের টোকিওতে অনুষ্ঠিত হয় অলিম্পিকের ৩২তম আসর। এতে তিনটি স্বর্ণ, দুটি রৌপ্য ও দুটি ব্রোঞ্জসহ মোট সাতটি পদক জয় করেন ইরানের অ্যাথলেটরা। এর আগে অলিম্পিকের রিও আসরে ইরানি প্রতিনিধি দল তিনটি স্বর্ণ, একটি রৌপ্য ও চারটি ব্রোঞ্জপদক জিতেছিল।

এবারের অলিম্পিকে ইরানের হয়ে প্রথম স্বর্ণপদক জয় করেন শুটার জাভাদ ফোরুকি। তিনি পুরুষদের ১০ মিটার এয়ার পিস্তলে শীর্ষ স্থান লাভ করেন। ইরানি এই অ্যাথলেট ২৪৪ দশমিক ৮ পয়েন্টে সংগ্রহ করে অলিম্পিকে রেকর্ড করেন। রৌপ্যপদক জয়ী সারবিয়ার দামির মিকেককে ৬ দশমিক ৯ পয়েন্ট ব্যবধানে পেছনে ফেলেন। অলিম্পিক শুটিংয়ের ইতিহাসে এটি ইরানের প্রথম স্বর্ণপদক।

ইরানের গ্রেকো-রোমান কুস্তিগির মোহাম্মাদ রেজা গেরায়েই ইরানের জন্য দ্বিতীয় স্বর্ণপদক জয় করেন। তিনি ইউক্রেনের পারভিজ নাসিবভকে পুরুষদের গ্রেকো-রোমান ৬৭ কেজির ফাইনাল বাউটে ৯-১ পয়েন্টে হারিয়ে শীর্ষ স্থান লাভ করেন।

ইরানের জন্য তৃতীয় স্বর্ণপদক লাভ করেন সাজাদ গানজাদেহ। তিনি পুরুষদের কারাতে কুমিতে ৭৫ কেজি ওজন শ্রেণিতে স্বর্ণপদক জয় করেন। ফাইনাল ম্যাচে তিনি সৌদি আরবের তারেহ হামেদিকে পরাজিত করেন। এবারের টোকিও অলিম্পিকের ১৭টি স্পোর্টসে ৬৬জন অ্যাথলেটকে পাঠায় ইরান।

প্যারালিম্পিকে ইরানের ২৪টি মেডেল

টোকিও প্যারালিম্পিক গেমসে মোট ২৪টি মেডেল জেতেন ইরানি অ্যাথলেটরা। পদক তালিকায় ইরানের স্থান ১২তম । গত ৪ সেপ্টেম্বর প্রতিযোগিতার ১১তম দিনে ২০২০ প্যারালিম্পিকের ফাইনালে রুশ দলকে পরাজিত করে ইরানের জাতীয় সিটিং ভলিবল দল। এদিন স্বর্ণপদক জয় করেন প্যারাতাইকোয়ান্দো আসগার আজিজি আকদাম। অন্যদিকে শট পুট প্রতিযোগিতায় রৌপ্যপদক জেতেন সাজ্জাদ মোহাম্মাদিয়ান। এছাড়াও ইরানের সাদেক বেইত চাকতি নিক্ষেপে রুপার মেডেল লাভ করেন।

এবারের প্যারালিম্পিক গেমসে বিস্ময়কর সাফল্য দেখিয়েছেন ইরানের নারী অ্যাথলেটরা। বিশ্বের মর্যাদাপূর্ণ এই ক্রীড়া ইভেন্টের এবারের আসরে দেশটির নারীরা তিনটি ডিসিপ্লিনে অংশ নিয়ে তিনটি সোনার মেডেল ঘরে তোলেন। এর মধ্য দিয়ে প্যারালিম্পিকের ইতিহাস বইয়ে নাম তোলেন নিজেদের।

৪ সেপ্টেম্বরে প্রতিযোগিতা শেষে টোকিও প্যারালিম্পিকে ইরান ১২টি স্বর্ণ, ১১টি রৌপ্য ও ১টি ব্রোঞ্জ মেডেলসহ মোট ২৪টি মেডেল জিতে ১২তম স্থান লাভ করে। মেডেল জয়ের জন্য প্যারা অ্যাথলেটদের অভিনন্দন ও শুভেচ্ছা জানান দেশটির ক্রীড়া ও যুব মন্ত্রণালয়।

বিশ্ব কুস্তি চ্যাম্পিয়নশিপে ইরান দ্বিতীয়

বিশ্ব কুস্তি চ্যাম্পিয়নশিপে ৬ পদক জিতে দ্বিতীয় হয়েছে ইসলামি প্রজাতন্ত্র ইরান। নরওয়ের অসলোতে অনুষ্ঠিত বিশ্ব কুস্তি চ্যাম্পিয়নশিপ ২০২১ গত ২ অক্টোবর শুরু হয়ে পর্দা নামে ১০ অক্টোবর। এদিকে, বিশ্ব কুস্তি চ্যাম্পিয়নশিপে ইরানি কুস্তিগিরদের সাফল্যে অভিনন্দন জানিয়েছেন দেশটির সর্বোচ্চ নেতা আয়াতুল্লাহিল উজমা খামেনেয়ী।

তিনি কুস্তিগির ও তাদের কোচদের অভিনন্দন জানিয়ে বলেছেন, সাবাস! ইরানি কুস্তিগির ও তাদের প্রশিক্ষকেরা। আপনারা সবার বিশেষকরে তরুণদেরকে আনন্দিত করেছেন। তিনি এই অভিনন্দন বার্তায় ইরানি কুস্তিগির ও প্রশিক্ষকদের সার্বিক সাফল্য কামনা করেন।

জুনিয়র কুস্তি বিশ্বকাপে ইরানের শিরোপা জয়

জুনিয়র বিশ্ব চ্যাম্পিয়নশিপের শিরোপা জিতেছে ইরানের ফ্রিস্টাইল কুস্তি দল। ১৮ আগস্ট আন্তর্জাতিক ইভেন্টটির ফাইনাল অনুষ্ঠিত হয়। রাশিয়ার উফায় অনুষ্ঠিত এই প্রতিযোগিতায় ইরানি কুস্তিগিররা ৫টি স্বর্ণ, একটি রৌপ্য ও একটি ব্রোঞ্জপদকসহ মোট সাতটি পদক জয় করে চ্যাম্পিয়ন হওয়ার গৌরব অর্জন করে।

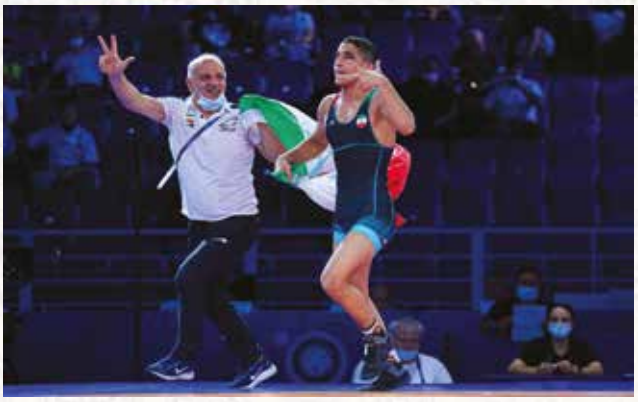

ইরানি যুব অ্যাথলেটেরা এই জয়ের জন্য ছয় বছর ধরে অপেক্ষা করছিল। অবশেষে সেই অপেক্ষার অবসান ঘটে শিরোপা ঘরে তোলার মধ্য দিয়ে। ২০১৫ সালের পর এই প্রথম ইরান জুনিয়র বিশ্ব চ্যাম্পিয়নশিপের শিরোপা জিতল।

ফ্রিস্টাইল কুস্তির শীর্ষ অবস্থান দখল করতে ইরান মোট ১৭৮ পয়েন্ট সংগ্রহ করে। ইরানের পাঁচ স্বর্ণজয়ী কুস্তিগির হল রহমান আমুজাদ খলিলি (৬১ কেজি), ইরফান এলাহি (৭০ কেজি), মোহাম্মাদ নোখোদি (৭৯ কেজি), আমির হোসেইন ফিরুজপুর (৮৬ কেজি) ও আলি আকবারপুর (১২৫ কেজি)।

অন্যদিকে, মাহদি হাজিলুইয়েন ৯২ কেজিতে রৌপ্য ও আলিরেজা আবদুল্লাহি ৯৭ কেজিতে ব্রোঞ্জ পদক জেতে।

এশিয়ান কুস্তি চ্যাম্পিয়নশিপে ইরানের শিরোপা জয়

২০২১ এশিয়ান কুস্তি চ্যাম্পিয়নশিপের শিরোপা জিতেছে ইরান গ্রেকো-রোমান কুস্তি দল। গত ১৪ এপ্রিল কাজাখস্তানের আলমাতিতে দলটি শিরোপা নিশ্চিত করে। গত বছর ৭৭ কেজি ওজন-শ্রেণিতে রৌপ্যজয়ী পেজমান পোশতাম কোনো লড়াই ছাড়াই এবার স্বর্ণপদক লাভ করেছেন। তাজিকিস্তানের প্রতিপক্ষ দলের রিজা জাদে ইঞ্জুরির কারণে প্রতিযোগিতায় অংশ না নেওয়ায় তিনি বিনা প্রতিদ্বন্দ্বিতায় সোনা ঘরে তোলেন।

আন্তর্জাতিক কুস্তি অঙ্গনে ইরানের নতুন মুখ নাসের আলিজাদেহ জয় দিয়ে পরিচিত হওয়ার সৌভাগ্য লাভ করেছেন। তিনি ৮৭ কেজিতে কাজাখস্তানের আতাবেক আজিসবেকোভকে ৩-১ পয়েন্টে হারিয়ে স্বর্ণপদক জয় করেন। ৯৭ কেজিতে মাহদি বালি দক্ষিণ কোরিয়ার সিউংজিউন কিমকে হারিয়ে সোনা জয় করেন।

জুনিয়র ওয়ার্ল্ডে রানার-আপ ইরানের জিআর টিম

ইরানের গ্রেকো-রোমান টিম রাশিয়ার উফায় জুনিয়র ওয়ার্ল্ড চ্যাম্পিয়নশিপে রানার-আপ হয়েছে। ১৩০ পয়েন্ট পেয়ে ইরানের এ দলটি একটি স্বর্ণপদক, একটি রৌপ্য ও পাঁচটি ব্রোঞ্জপদক পায়। স্বাগতিক দেশ রাশিয়া ১৮৩ পয়েন্ট পেয়ে চ্যাম্পিয়ন ও ১০১ পয়েন্ট পেয়ে আজারবাইজান তৃতীয় স্থান অধিকার করে। ৫৫ কেজি ফাইনাল বাউটে উজবেকিস্তানের আলিমার্দন আবদুলায়েফকে হারিয়ে ৩-১ সেটে আমিররেজা দেহবোজর্গি স্বর্ণপদক জেতে। রাশিয়ার দিনিসলাম বামাতোফের কাছে ৬০ কেজি ফাইনাল বাউটে ৭-৩ সেটে হেরে যায় সাইদ এসমায়েলি। রোমানিয়ার মানুয়েল স্টোইকাকে ৬৩ কেজিতে ৯-০ সেটে পরাস্ত করে ইমান মোহাম্মাদি। মিসরের এমাদ আবোলাট্টাকে পরাস্ত করে মোহাম্মাদহোসেইন আজারমদখত।

তুর্কি টুর্নামেন্টে ইরানের ফ্রিস্টাইল কুস্তিগিরদের ৯টি মেডেল জয়

তুরস্কের ইয়াসার দোগু কাপে ৫টি স্বর্ণ, ১টি রৌপ্য ও ৩টি ব্রোঞ্জ পদক জিতেছে ইরানের পুরুষ ফ্রিস্টাইল কুস্তি দল। গত ২৭ জুন তুরস্কের ইস্তাম্বুলে ইয়াসার দোগু কাপ রেসলিং টুর্নামেন্টের পর্দা নামে। প্রতিযোগিতা শেষে ইরানি ফ্রিস্টাইল কুস্তি দল মোট ৯টি মেডেল ঘরে তুলতে সক্ষম হয়।

মর্যাদাপূর্ণ এই তুর্কি টুর্নামেন্টে ইরানের ১৩জন খেলোয়াড় দেশের প্রতিনিধি হিসেবে অংশ নেন।

আলি গোলিজাদেগান ৫৭ কেজি ওজন-শ্রেণিতে, রহমান আমুজাদ ৬১ কেজি, মোহাম্মাদ নোখোদি ৭৯ কেজি, আমির হোসেইন ফিরুজপুর ৮৬ কেজি, আব্বাস ফোরুতান ১২৫ কেজিতে স্বর্ণপদক জয় করেন। অন্যদিকে হামিদরেজা জাররিন পেইকার ৭৯ কেজিতে রুপার মেডেল জিতেন, হাসান ইবাদি ও কিয়ান মাহমুদজানলু ৬৫ কেজিতে ব্রোঞ্জপদক ও ইরফান ইলাহি ৭০ কেজিতে ব্রোঞ্জ মেডেল জিতেন।

এশিয়ান অনূর্ধ্ব-১৯ বিচ ভলিবল চ্যাম্পিয়ন ইরান

এশিয়ান অনূর্ধ্ব-১৯ বিচ ভলিবল চ্যাম্পিয়নশিপের মুকুট জয় করেছে ইরান। চ্যাম্পিয়নশিপের এবারের তৃতীয় পর্বে থাইল্যান্ডকে হারিয়ে চ্যাম্পিয়ন হওয়ার গৌরব অর্জন করে ইরানি অ্যাথলেটেরা। ইরানের আবুলহাসান খাকিজাদে ও আলি গোরবানপাসান্দি থাইল্যান্ডের নেতিতোর্ন মুনিকুল ও ওয়াচিরাবিত মুয়াদফাকে ২-০ (২১-১৮, ২১-১৫) সেটে পরাজিত করে।

অন্যদিকে থাইল্যান্ড বি দলকে ২-০ সেটে হারিয়ে ব্রোঞ্জপদক লাভ করে কাজাখস্তান। ইরান কাজাখস্তান বি দলের বিরুদ্ধ ২-০ সেটে জয় দিয়ে এশিয়ান অনূর্ধ্ব-১৯ বিচ ভলিবল চ্যাম্পিয়নশিপ শুরু করে এবং দ্বিতীয় দিনে বাহরাইনকেও ২-০ সেটে পরাজিত করে।

ইরানি দল কোয়ার্টারে থাইল্যান্ড সি দলকে ২-০ সেটে হারায় এবং সেমিতে থাইল্যান্ড বি দলের বিরুদ্ধে ২-০ সেটে জয় পায়। থাইল্যান্ডের নাখোন পাথোমে ৩ থেকে ৭ জুলাই এই প্রতিযোগিতা অনুষ্ঠিত হয়।

এশিয়ান প্যারা তাইকোয়ান্দো চ্যাম্পিয়নশিপে ইরানের শিরোপা জয়

এশিয়ান প্যারা তাইকোয়ান্দো চ্যাম্পিয়নশিপের নারী-পুরুষ উভয় বিভাগে চ্যাম্পিয়ন হওয়ার গৌরব অর্জন করেছে ইরানের জাতীয় প্যারা তাইকোয়ান্দো দল। গত ১৫ জুন লেবাননের বৈরুতে প্রতিযোগিতা শেষে ইরানি দল মোট ৪টি স্বর্ণ, ১টি রৌপ্য ও ২টি ব্রোঞ্জ মেডেল জয় করে। এবার নিয়ে ষষ্ঠ বছরের মতো এশিয়ান প্যারা তাইকোয়ান্দো চ্যাম্পিয়নশিপের শিরোপা জয় করল ইরান।

ইরানের মাহদী পৌরহেনামা, আসগর আজিজি, সাইদ সাদেঘিয়ানপুর এবং মাহতাব নববী স্বর্ণপদক লাভ করেন, হামেদ হাঘশেনাস রৌপ্য এবং মাহদি বাহরামি আজার ও রায়েহে শাহাব ব্রোঞ্জপদক জিতেন।

এশিয়ান ভারোত্তোলনে ইরানের মোতামেদির সোনা জয়

উজবেকিস্তানের তাশখন্দে ২০২১ এশিয়ান ভারোত্তোলন চ্যাম্পিয়নশিপে স্বর্ণপদক জিতেছেন ইসলামি প্রজাতন্ত্র ইরানের রাসুল মোতামেদি। ২৪ এপ্রিল ১০২ কেজি ওজন-শ্রেণিতে এশিয়ান ভারোত্তোলন চ্যাম্পিয়নশিপ ও অলিম্পিক বাছাই পর্বের এই প্রতিযোগিতা অনুষ্ঠিত হয়।

ইভেন্টে ইরানের রাসুল মোতামেদি ও রেজা দেহদার তাঁদের প্রতিদ্বন্দ্বীদের পরাজিত করে প্রথম স্থান অধিকার করেন। স্ন্যাচে রেজা প্রথম প্রচেষ্টায় ১৬৬ কেজি ওজন তোলেন এবং দ্বিতীয় প্রচেষ্টায় তোলেন ১৭২ কেজি। তৃতীয়বার ১৭৫ কেজি ওজন তুলে স্বর্ণপদক জয় করেন। মোতামেদি স্ন্যাচে একটি ব্রোঞ্জপদক ও ক্লিন অ্যান্ড জার্কে দুটি স্বর্ণপদক জিতেন।

ইন্টারন্যাশনাল শুটিং স্পোর্টস ফেডারেশন (আইএসএসএফ) বিশ্বকাপে চতুর্থ ইরান

আইএসএসএফ বিশ্বকাপে চতুর্থতম স্থান লাভ করেছে ইরান। ২১ মার্চ প্রতিযোগিতার তৃতীয় দিনে পুরুষ দলের এয়ার রাইফেল ইভেন্টে ইরানি টিম এই সাফল্য অর্জন করে।

ব্রোঞ্জ মেডেল ম্যাচে অংশ নেন দক্ষিণ কোরিয়ার (৬২১.২) তাইয়েউন নাম, বাইউংগিল চু ও জা সেং চুং এবং ইরানের পুরিয়া নরোজিয়ান, হোসেইন বাঘেরি ও আমির মোহাম্মদ নেকৌনাম।

কোরিয়া, সিঙ্গাপুর, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র, যুক্তরাজ্য, ইরান, ইউক্রেন, ফ্রান্স, হাঙ্গেরি, ইতালি, থাইল্যান্ড এবং তুরস্কসহ ৫৩টি দেশের মোট ২৯৪ জন শুটার টুর্নামেন্টে অংশ নেন।

রুশ লিগে বর্ষসেরা খেলোয়াড় ইরানের আজমুন

ইরানি স্ট্রাইকার সরদার আজমুন রুশ প্রিমিয়ার লিগে (আরপিএল) ২০২০-২০২১ সেশনের জন্য বর্ষসেরা খেলোয়াড় নির্বাচিত হয়েছেন।

এফসি জেনিতের ওয়েবসাইটে প্রকাশিত প্রতিবেদন মতে, আরপিএল এর বর্ষসেরা খেলোয়াড় নির্বাচনে ভোট দেন আরপিএল ব্যবস্থাপকরা, রুশ দলের প্রধান কোচ স্টেনিসলাভ চেরচেসোভ এবং আরপিএল টিম ক্যাপ্টেনরা।

ইরানি স্ট্রাইকার আজমুন ভোটে ৭৬ পয়েন্ট পেয়ে বছরের সেরা খেলোয়াড় নির্বাচিত হন। দ্বিতীয় সর্বাধিক ৬১ পয়েন্ট পান আরতেম দিজিউবা এবং তৃতীয় সর্বাধিক ৫১ পয়েন্ট পান সাবেক জেনিত খেলোয়াড় নোবোয়া। ২০২০-২১ সেশনে আজমুন মোট ১৯টি গোল করেন।

খেলাধুলার আরও অনেক ক্ষেত্রেই ইসলামি প্রজাতন্ত্র ইরান সাফল্যের স্বাক্ষর রেখে চলেছে যা এই সীমিত পরিসরে তুলে ধরা সম্ভব নয়। তবে একথা বলা যায়, খেলাধুলায় ইরানের সফলতার এই ধারা অব্যাহত থাকলে দেশটি একদিন ক্রীড়াক্ষেত্রে বিশ্বের শীর্ষস্থানীয় দেশগুলোর মধ্যে নিজের অবস্থান করে নিতে সক্ষম হবে তাতে কোনও সন্দেহ নেই।

ইরানে চিকিৎসাবিজ্ঞানের পথিকৃৎ আল-রাজি ও আজকের বাস্তবতা

রাশিদ রিয়াজ

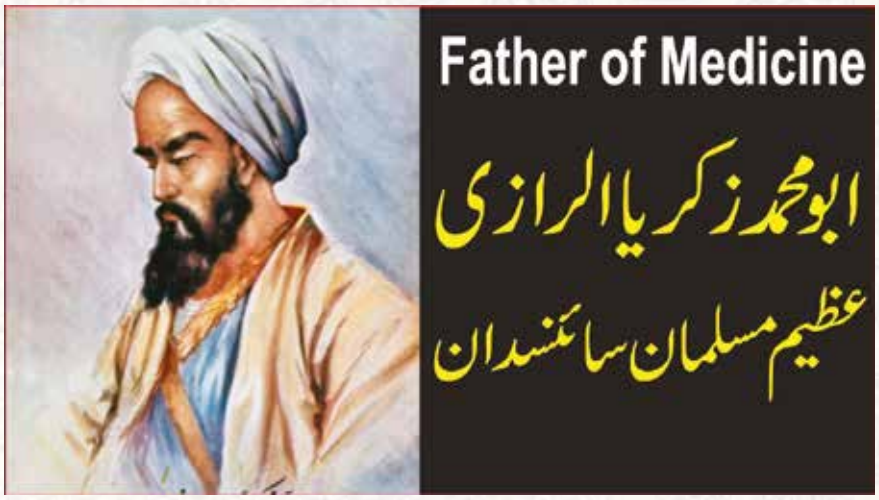

ইরানের চিকিৎসাবিজ্ঞানী আবু বকর মুহাম্মাদ বিন জাকারিয়া আল-রাজি ৮৬৫ খ্রিস্টাব্দে (২৫১ হিজরি) পারস্যের 'রেই' নগরীতে জন্মগ্রহণ করেন। আলবোর্জ পর্বতমালার দক্ষিণের ঢালে বিখ্যাত সিল্ক রোডের পাশে এই নগরীটি অবস্থিত। বর্তমানে এটি বৃহত্তর তেহরানের অংশ। আল-রাজি ইউরোপে 'রাজেশ' নামে পরিচিত।

রাজি ছিলেন দরিদ্র পরিবারের সন্তান। জীবনের শুরুতে সাধারণ শিক্ষা গ্রহণ করেন। তরুণ বয়সে উদ্দেশ্যহীন জীবনযাপন করতেন। বিভিন্ন আসর, বন্ধুদের সঙ্গে আড্ডাবাজি ইত্যাদি অনর্থক কাজে সময় কাটিয়ে দিতেন। (সও আজিম মুসলিম সাইন্সদা : ১৪৭)। পরবর্তী সময়ে রসায়নবিদ্যার প্রতি তাঁর প্রবল আগ্রহ সৃষ্টি হয়। 'কিমিয়াগিরির' (লোহা ও পিতল ইত্যাদিকে স্বর্ণে রূপান্তর করার একটি কৌশল) পেছনে সময় ও মেধা ব্যয় করতে থাকেন। কিমিয়াগিরির জন্য বাড়িতে আগুনের চুল্লি স্থাপন করেছিলেন। তাঁর বাড়ি সর্বদা ধোঁয়ায় পরিপূর্ণ থাকত। অতিরিক্ত ধোঁয়ার কারণে চোখ রোগাক্রান্ত হয়ে পড়ে। চিকিৎসার জন্য ডাক্তারের শরণাপন্ন হলে ডাক্তার ৫০০ আশরাফি মুদ্রার বিনিময়ে চোখের চিকিৎসা করেন। বিদায়কালে বলেন, রসায়নবিদ্যার আকর্ষণে তুমি যে কিমিয়াগিরি করছ সেটি আসল কিমিয়াগিরি নয়, আসল কিমিয়া হলো আমি যেটা করছি সেটা! (তারিখুল হুকামা : ৬)

চক্ষু ডাক্তারের ওই মন্তব্য মুহাম্মাদ রাজির জীবনের মোড় ঘুরিয়ে দেয়। চিকিৎসাশাস্ত্রে পারদর্শী হতে তিনি স্ত্রী-সন্তান ও বন্ধুদের বিদায় জানিয়ে বাগদাদের পথে যাত্রা করেন। বাগদাদের তৎকালীন শীর্ষ চিকিৎসক আলী ইবনে সাহলের শিষ্যত্ব গ্রহণ করেন। ইবনে সাহলের তত্ত্বাবধানে কঠিন অধ্যবসায় ও অধ্যয়নের ফলে চিকিৎসাশাস্ত্রে ব্যুৎপত্তি অর্জনে সক্ষম হন। দীর্ঘকাল চিকিৎসাশাস্ত্রের পাঠদান ও রোগীদের সেবা করার ফলে তাঁর নাম চিকিৎসাশাস্ত্রের ইমাম ও নতুন তত্ত্ব উদ্ভাবনকারীদের শীর্ষ তালিকায় উচ্চারিত হতে থাকে। বিখ্যাত মনীষী ইবনে খাল্লিকান বলেন, মুহাম্মাদ আল-রাজি চিকিৎসাবিজ্ঞানের পণ্ডিত ছিলেন। তাঁর যুগে তাঁকেই সেরা বলা হতো। তিনি চিকিৎসাশাস্ত্রের অসংখ্য মৌল তত্ত্বের আবিষ্কারক। বিশ্বের বিভিন্ন প্রান্তের মানুষ চিকিৎসাশাস্ত্রের দীক্ষা নিতে তাঁর কাছে আগমন করত। (হুকামায়ে ইসলাম : ১/২০১)

চিকিৎসাবিজ্ঞানে মুহাম্মাদ রাজির অবদান সম্পর্কে ইতিহাসবিদরা বলেন, 'চিকিৎসাশাস্ত্রের মৃত্যু ঘটেছিল, হাকিম জালিনুস আবার প্রাণ দান করেছেন। এ শাস্ত্রের নীতিমালা বিক্ষিপ্ত ও দুর্বল ছিল, ইমাম রাজি সেসব নীতিকে পরিমার্জন, পরিবর্ধন ও সুবিন্যস্ত করে কিতাবের আকৃতি দান করেছেন। চিকিৎসাশাস্ত্র অসম্পূর্ণ ছিল, ইবনে সিনা তার পূর্ণতা দান করেছেন।' (ইবনে খাল্লিকান : ২/৭৮)

ইমাম রাজি একজন প্রাজ্ঞ চিকিৎসক ছিলেন। রেই শহরের প্রধান হাসপাতালের প্রধান পরিচালকের পদে তাঁকে আসীন করা হয়। এ সময়েই তাঁর অসাধারণ যোগ্যতা ও কর্মদক্ষতার সুখ্যাতি সারা বিশ্বে ছড়িয়ে পড়ে। খলিফা মুকতাফির (১৭তম আব্বাসি খলিফা) রাজত্বকালে ইমাম রাজিকে বাগদাদে বদলি করা হয়। ৯০৩ খ্রিস্টাব্দে রেইয়ের শাসক মানসুর ইবনে ইসহাকের অনুরোধে তিনি আবার রেইয়ের সরকারি হাসপাতালে আগের পদে যোগদান করেন।

ইমাম রাজিই সর্বপ্রথম 'ফার্স্ট এইড' পদ্ধতি উদ্ভাবন করেন। এ পদ্ধতির নীতিমালাও তিনি প্রণয়ন করেন। 'মিজানে তিববি' নামক ওষুধের ওজন পরিমাপক যন্ত্র তাঁর হাত ধরেই আবিষ্কৃত হয়। এ নিক্তির মাধ্যমে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র জিনিসের সঠিক পরিমাপ জানা যায়। অ্যালকোহল আবিষ্কারকের নাম হিসেবেও মুহাম্মাদ রাজির নাম উচ্চারিত হয়। 'বংশপরাম্পরায় রোগের সৃষ্টি' তত্ত্বের ধারণা তিনিই সর্বপ্রথম প্রদান করেন। 'নশতার' নামক এক ধরনের অস্ত্রোপচার যন্ত্র আবিষ্কার করেন। (সও আজিম মুসলিম সাইন্সদা : ১৪৭)

শল্যচিকিৎসার প্রাণপুরুষ আল-রাজিই প্রথম চিকিৎসক যিনি হাম ও গুটি বসন্তকে আলাদা রোগ হিসাবে চিহ্নিত করেছিলেন। তিনি সালফিউরিক এসিড, ইথানল উৎপাদন ও পরিশোধন এবং চিকিৎসায় এর ব্যবহার পদ্ধতি উদ্ভাবন করেন।

আল-রাজি কেবল চিকিৎসাবিজ্ঞানীই ছিলেন না; বরং একাধারে দার্শনিক, গণিতবিদ ও রসায়নবিদ ছিলেন। ৯২৫ খ্রিস্টাব্দে একটি সফল জীবন শেষ করে জন্মশহর রেইতে ইন্তেকাল করেন এ

জগদ্বিখ্যাত মনীষী। তাঁর নামে ইরানে রাজি ইন্সটিটিউট ও ইরানের কেরমানশাহ শহরে রাজি বিশ্ববিদ্যালয় অবস্থিত। ইরানে প্রতি বছর ২৭ আগস্ট আল-রাজিকে স্মরণ করে রাজি দিবস পালন করা হয়।

মুহাম্মাদ রাজির রচনাবলি

আল-রাজি রসায়নবিজ্ঞান, পদার্থবিজ্ঞান, চিকিৎসাবিজ্ঞান ও অন্যান্য বিষয়ে প্রায় ২০০টির অধিক গ্রন্থ লিখেছেন। তাঁর গবেষণাকর্মের মধ্যে সবচেয়ে প্রসিদ্ধ হলো চিকিৎসাবিজ্ঞানের শ্রেষ্ঠ গ্রন্থ 'আল হাভি' এবং 'রসায়নশাস্ত্রের রহস্যাবলির রহস্য' শীর্ষক গ্রন্থ। দিনরাত পড়াশুনা ও গবেষণার এক পর্যায়ে তিনি অন্ধ হয়ে যান। এরপর তিনি বলতেন আর তাঁর ছাত্ররা তা লিখে রাখতেন। যখন তিনি মারা গেলেন তখন তাঁর ছাত্ররাই 'আল হাভি'র কাজ সমাপ্ত করেছিলেন। নিচে তাঁর কয়েকটি বইয়ের সংক্ষিপ্ত পরিচিতি তুলে ধরা হলো :

ক. আল-হাভি : 'আল-হাভি' হলো চিকিৎসাশাস্ত্রে লিখিত তাঁর জগদ্বিখ্যাত কিতাব। এটাকে চিকিৎসাবিজ্ঞানের আরবি ভাষার এনসাইক্লোপিডিয়া বলা হয়। এ বইতে চিকিৎসাশাস্ত্রের সূক্ষ্ম সূক্ষ্ম সমস্যার সমাধান ও আরব বিশ্বের চিকিৎসাবিজ্ঞানীদের মতামত লিপিবদ্ধ করেছেন। ইউনান, হিন্দুস্তান ও ইরানের চিকিৎসাবিজ্ঞানের সারনির্যাসকে নীতিমালার আলোকে একত্রিত করেছেন। শতাব্দীকাল ধরে এ বই পশ্চিমা বিশ্বের বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয়ের পাঠ্যসূচিতে অন্তর্ভুক্ত ছিল। ১২৭৯ খ্রিস্টাব্দে একজন ইহুদি চিকিৎসক এ বইয়ের ল্যাটিন অনুবাদ করেন। বইটির গ্রহণযোগ্যতা বোঝাতে এতটুকুই যথেষ্ট যে, ১৪৮৬ খ্রিস্টাব্দে সর্বপ্রথম অনুবাদ প্রকাশের পর ১৫৪২ খ্রিস্টাব্দ পর্যন্ত পনেরোর অধিক সংস্করণ ছাপা হয়!

খ. কিতাবুল মানসুরি : ইমাম রাজির বিখ্যাত রচনা। দশ খণ্ডে লিখিত বইটি শাসক মানসুরের নামে নামকরণ করেন। ইতালির মিলান শহরে পনেরো শতাব্দীর শেষের দিকে এর অনুবাদ প্রকাশিত হয়। অধুনা এর কিছু অংশ ফ্রেঞ্চ ও জার্মান ভাষায় অনূদিত হয়েছে।

গ. কিতাবুল জাদারি ওয়াল হাসাবা : আরেকটি জনপ্রিয় কিতাব। ইতিহাসে সর্বপ্রথম এই কিতাবে বসন্ত, জলবসন্ত ও হাম রোগের চিকিৎসা সম্পর্কে বিস্তারিত সমাধান দেওয়া হয়। রাজির আগে অন্য কেউ এ বিষয়ে কলম ধরেনি। বসন্তের ধরন নির্ণয়ের ভিত্তিতে তিনি প্রতিষেধক উদ্ভাবন করেন। ১৫৬৫ খ্রিস্টাব্দে প্রথমে ল্যাটিন ভাষায় অনুবাদ প্রকাশিত হয়। পরবর্তী সময়ে ইউরোপের বিভিন্ন ভাষায় কিতাবটির অনুবাদ হয়। এ বইটিই ইমাম রাজিকে মধ্যযুগের সর্বশ্রেষ্ঠ চিকিৎসা বিজ্ঞানীরূপে প্রতিষ্ঠিত করে। ইংরেজি অনুবাদ হয় ১৮৪৭ খ্রিস্টাব্দে। ফ্রেঞ্চ, ইউনান ও জার্মান ভাষায়ও এটির অনুবাদ প্রকাশিত হয়েছে। বিশ্বের বিভিন্ন দেশের জাতীয় পাঠ্যক্রমে কিতাবটি অন্তর্ভুক্ত ছিল।

ঘ. আল-ফুসুল ফিত-তিব : রাজির বিখ্যাত কিতাব। সর্বপ্রথম ইবরানি ভাষায় তরজমা প্রকাশিত হয়। লন্ডনে এর অনুবাদ বিদ্যমান আছে। ল্যাটিন ভাষায়ও অনূদিত হয়েছে।

ঙ. কিতাবুত তিববিল মুলুকি : আরেকটি প্রসিদ্ধ কিতাব। তাবারিস্তানের (ইরানের বিখ্যাত নগরী) শাসক আলি ইবনে উমসুজানের নামে বইটির নামকরণ করেন। এটির হাতেলেখা

পাণ্ডুলিপি লন্ডন লাইব্রেরিতে বিদ্যমান আছে। (ইসলামি এনসাইক্লোপিডিয়া : ৮১৯, উলুম ওয়া ফুনুন আহদে আব্বাসি : ১২৬)

চ. কিতাবুল আসরার : গুরুত্বপূর্ণ ও সুপরিচিত কিতাব। প্রসূতিবিদ্যা, চক্ষুরোগ ও মহিলা রোগের চিকিৎসা বিষয়ে এ কিতাবের গ্রহণযোগ্যতার কথা পশ্চিমা বিশ্ব নির্দ্বিধায় স্বীকার করে নিয়েছে। (আরবু কে ইলমি কারনামে : ৭০)।

লেখালেখিতে ইমাম রাজির স্বভাবজাত আগ্রহ ও যোগ্যতা ছিল। সর্বদা লেখার কাজে নিমগ্ন থাকতেন। চিকিৎসাবিজ্ঞান ছাড়াও আকিদা, যুক্তিবিদ্যা, দর্শন, মহাকাশ ইত্যাদি বিষয়ে লেখা তাঁর রচনাবলি বিশেষ মর্যাদায় আসীন। পশ্চিমা বিশ্বের চিকিৎসা, দর্শন ইত্যাদির ওপর ইমাম রাজির রচনাবলির ব্যাপক প্রভাব রয়েছে।

১৯১৯ খ্রিস্টাব্দে ব্রিটেন কংগ্রেস আয়োজিত আন্তর্জাতিক সেমিনারে ইমাম রাজির জীবন ও অবদানের ওপর আলোচনা অনুষ্ঠিত হয়। বক্তারা কৃতজ্ঞতা ও প্রশংসা জ্ঞাপনসূচক বাক্যে ইমামকে উল্লেখ করেন। ১৯৩০ খ্রিস্টাব্দে ইমাম রাজির মৃত্যুর হাজার বছর পূর্তি উপলক্ষে আয়োজিত অনুষ্ঠানে অতিথিদের সবাই তাঁকে ইতিহাসের শ্রেষ্ঠ চিকিৎসাবিজ্ঞানী হিসেবে স্বীকৃতি প্রদান করেন।

ইরানের বর্তমান চিকিৎসাব্যবস্থা

আজকের দিনে ইরান যখন নিজেদের ওষুধ চাহিদার ৯৮ শতাংশ নিজেরাই তৈরি করে তখন বোঝা যায় চিকিৎসাবিজ্ঞানে আল-রাজির মতো বিদগ্ধ পণ্ডিতরা দেশটির এ শাখায় প্রাচীনকালেই ভিত গড়ে দিয়ে গেছেন। অভ্যন্তরীণ চাহিদার শতকরা ১০০ ভাগ ওষুধ উৎপাদনের লক্ষ্য নিয়ে এগিয়ে যাচ্ছে ইরান। গত বছর ৯৭০টি লাইসেন্স ইস্যু করা হয়েছে, এর মধ্যে ৮০টি লাইসেন্স দেওয়া হয়েছে এমন সব ওষুধ তৈরির জন্য যা দেশে এই প্রথমবারের মতো তৈরি হচ্ছে।

একটি দেশের বিরুদ্ধে ৪ দশকেরও বেশি সময় ধরে যখন অন্যায়ভাবে অবরোধ ও ওষুধ আমদানির ওপর নিষেধাজ্ঞা চলে আসছে তখনো ইরান করোনাভাইরাস মোকাবেলায় এমনভাবে লড়ছে যেখানে জাতীয় জাগরণের আভাস পাওয়া যায়। ইরানই একমাত্র মুসলিম দেশ যারা অন্তত তিনটি দেশের সঙ্গে করোনাভাইরাসের টিকা যৌথভাবে ও নিজেদের উদ্ভাবিত তিনটি টিকা উৎপাদনে করছে। এর বাইরে আরো কয়েকটি টিকার ক্লিনিক্যাল ট্রায়াল চলছে। ইতিমধ্যে ইরান জার্মানি ও তুরস্কসহ কয়েকেটি দেশে করোনাভাইরাস শনাক্তকরণ কিট রপ্তানি শুরু করার পর দক্ষিণ আমেরিকাসহ বিশ্বের বিভিন্ন দেশে ইরানের কিটের চাহিদা দিন দিন বৃদ্ধি পাচ্ছে।

ইরানের সর্বোচ্চ নেতা আয়াতুল্লাহ খামেনেয়ী ইরানের নিজস্ব টিকা 'কোভিড বারাকাত' গ্রহণ করেছেন। লক্ষ্যণীয় বিষয় হচ্ছে নির্বাচিত হওয়ার পর ইরানের নতুন প্রেসিডেন্ট ড. রায়িসি ইরানের তৈরি করোনা ভ্যাকসিন নিয়েছেন। তাঁর নেওয়া 'কোভ-ইরান বারাকাত' নামের ওই ভ্যাকসিন ইরানের তরুণ গবেষক ও বিজ্ঞানীদের নিরলস

প্রচেষ্টার ফসল। সকল প্রকার ট্রায়াল শেষে এই ভ্যাকসিন প্রদানের অনুমতি মিলেছে। প্রেসিডেন্ট রায়িসি এ টিকা নিয়ে 'কোভ-ইরান বারাকাত' তৈরির ক্ষেত্রে নিয়োজিত তরুণ বিজ্ঞানী ও গবেষকদের শ্রম ও মেধাকে স্বীকৃতি দিয়েছেন ও তাঁদেরকে সম্মানিত করেছেন। 'কোভ-ইরান বারাকাত' ভ্যাকসিন ব্যবহারের লাইসেন্স পাবার মধ্য দিয়ে ইরান করোনার টিকা প্রস্তুতকারী বিশ্বের ছয়টি দেশের মধ্যে নিজেদের স্থান করে নিয়েছে। আগামী বছরে মুখে নেওয়ার মতো কোভিড ওরাল ভ্যাকসিন তৈরির উদ্যোগ নিয়েছে ইরান। ইরানের মোট ৯টি স্থানীয় ফার্ম করোনাভাইরাস ভ্যাকসিন উৎপাদন নিয়ে কাজ করছে। দুটি ভ্যাকসিন ক্লিনিক্যাল লাইসেন্স লাভের দ্বারপ্রান্তে রয়েছে।

এসব গবেষণা নিরন্তর চলার পেছনে উৎসাহ যুগিয়েছে তাদের উত্তরসূরি চিকিৎসাবিজ্ঞানীরা। তাঁদের মতো আরো অনেক চিকিৎসাবিজ্ঞানীর অশেষ পরিশ্রম ও ধারাবাহিক প্রচেষ্টায় আজকে ইরানে ৬শ'র বেশি কোম্পানি মেডিক্যাল যন্ত্রপাতি তৈরি করে যা ইরানের মোট চাহিদার শতকরা ৩৫ ভাগ। বিভিন্ন দেশে যখন কোভিড মহামারিতে প্রয়োজনীয় চিকিৎসা সরঞ্জাম, আইসিইউ, ভেন্টিলেটরসহ বিভিন্ন উপকরণের সংকট চলছে তখন ইরান এসব উপকরণ অনেক দেশে রফতানি করছে।

পশ্চিম এশিয়ায় বৃহত্তম ওষুধ উৎপাদকে পরিণত হবে ইরান এমন লক্ষ্যমাত্রা নিয়ে এগিয়ে যাচ্ছে দেশটি। আর এধরনের লক্ষ্যমাত্র নিয়ে আগানো সম্ভব হচ্ছে ইরানের বিজ্ঞানীদের উচ্চ বৈজ্ঞানিক সক্ষমতা ও সামর্থ্য এবং ওষুধ উৎপাদনের প্রয়োজনীয় উপাদান নিজেরাই তৈরি করতে পেরেছে বলে।

বিশ্বখ্যাত ৩৫ জন স্টেম সেল প্রতিস্থাপন ডাক্তারের তালিকায় রয়েছেন ইরানি চিকিৎসক আমির আলি হামিদিয়ে। 'দেড় মিলিয়ন হেমাটোপয়েটিক স্টেম সেল ট্রান্সপ্লান্ট' শীর্ষক এক নিবন্ধে তিনি সেরা ৩৫ জনের মধ্যে স্থান পান। তাঁর মতো অনেক চিকিৎসাবিজ্ঞানী তাঁদের উত্তরসূরির গবেষণার ভিত্তিকেই অনুসরণ করে নিত্যনতুন আবিষ্কার করছেন।

এরই মধ্যে ইরান ইন্দোনেশিয়ায় আধুনিক টেলিসার্জারি কেন্দ্র প্রতিষ্ঠার সিদ্ধান্ত নিয়েছে। রোবটের সাহায্যে দূরবর্তী স্থানে অস্ত্রোপচারের জন্য ইন্দোনেশিয়ায় দুটি আধুনিক টেলিসার্জারি কেন্দ্র প্রতিষ্ঠা করবে ইরান। এছাড়া পশ্চিম এশিয়ায় প্রথম আয়ন থেরাপি কেন্দ্র চালু করেছে ইরান। আগামী বছরে থেকে কেন্দ্রটিতে সব ধরনের ক্যান্সারের জন্য সুনির্দিষ্ট চিকিৎসা সেবা প্রদান করা হবে। বিশ্বে এই ধরনের প্রযুক্তি মাত্র ছয়টি দেশের হাতে আছে।

একই সঙ্গে ইরানে নিয়মিত আন্তর্জাতিক সেমিনার অনুষ্ঠিত হচ্ছে। তেহরানে পঞ্চম ইন্টারন্যাশনাল হেলথ কংগ্রেস শুরু হওয়ার পর আশা করা হচ্ছে এ আয়োজন মুসলিম দেশগুলোর মধ্যে পর্যটন উন্নয়ন ও সহযোগিতা বাড়াতে ভূমিকা রাখবে, একই সঙ্গে মেডিকেল টুরিজ্যম, স্পোর্টস টুরিজ্যম, পুষ্টি ও স্বাস্থ্যকর খাবার ও ল্যাবরেটরি ইকুয়েপমেন্ট নিয়েও এ কংগ্রেসে আলোচনায় উপকৃত হয়েছে দেশগুলো।

সম্প্রতি রাশিয়া, জার্মানি এবং ইকুয়েডরে 'ব্রেন সার্জারি নেভিগেশন সিস্টেম' রফতানি শুরু করছে ইরান। মস্তিষ্কে অস্ত্রোপচারের এসব জটিল উপকরণ বর্তমানে ইরানের ৮০টি হাসপাতালে ব্যবহৃত হচ্ছে। উপকরণগুলো কৌশলগত পণ্য হিসেবে বিবেচনা করা হয়। মস্তিষ্কের বিভিন্ন ধরনের জটিল অস্ত্রোপচারে এধরনের উপকরণ ব্যবহৃত হয়ে আসছে। এধরনের ডিভাইস সার্জনকে অস্ত্রোপচারের সময় প্রয়োজনীয় সঠিক দিক নির্দেশনা দিতে সক্ষম। টিউমার, সাইনাস ও মাথার খুলি, এমনকি স্পাইনাল কর্ড বা মেরুদণ্ড অপারেশনে এসব ডিভাইস খুবই উপযোগী। ফলে চিকিৎসকরা এধরনের অস্ত্রোপচারের সময় বাড়তি সাহস পেয়ে থাকেন। সঠিক সময়ের মধ্যে অস্ত্রোপচারে আস্থাও পান। তুরস্কে এধরনের ডিভাইস রপ্তানির কথা চলছে। ইরানের দেড়শ চিকিৎসক অন্তত ৬ হাজার রোগীর মস্তিষ্কের অস্ত্রোপচারে এসব ডিভাইস ব্যবহার করেছেন।

বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থার (হু) পূর্ব ভূমধ্যসাগরীয় অঞ্চলের পরিচালক আহমেদ আল-মানদারি বলেছেন, প্রাথমিক স্বাস্থ্যসেবার জন্য ইরান হচ্ছে রোল মডেল। ইরান জুড়ে ৬৯৬টি প্রাথমিক স্বাস্থ্যসেবা কেন্দ্রের উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে দেওয়া এক বার্তায় তিনি এই মন্তব্য করেন। মানদারি বলেন, বিগত চার দশক ধরে ইরানের প্রাথমিক স্বাস্থ্যসেবা নেটওয়ার্ক জনগণের সময়মতো সাশ্রয়ী মূল্যে, গ্রহণযোগ্য প্রয়োজনীয় স্বাস্থ্য পরিষেবা নিশ্চিতের লক্ষে কাজ করছে। তিনি বলেন, এসব নতুন স্বাস্থ্যসেবা কেন্দ্র স্বাস্থ্যসেবা প্রদানের আওতা বাড়াতে সাহায্য করবে এবং শতভাগ স্বাস্থ্যসেবা নিশ্চিতের দিকে এগিয়ে নিয়ে যাবে।

উল্লেখ্য, বর্তমানে প্রায় সব ইরানিই রাষ্ট্র সমর্থিত স্বাস্থ্যবিমা পরিষেবা পান।

ইবনে সিনা : মধ্যযুগের বিশ্বসেরা চিকিৎসাবিজ্ঞানী ও দার্শনিক

ড. আবদুস সবুর খান

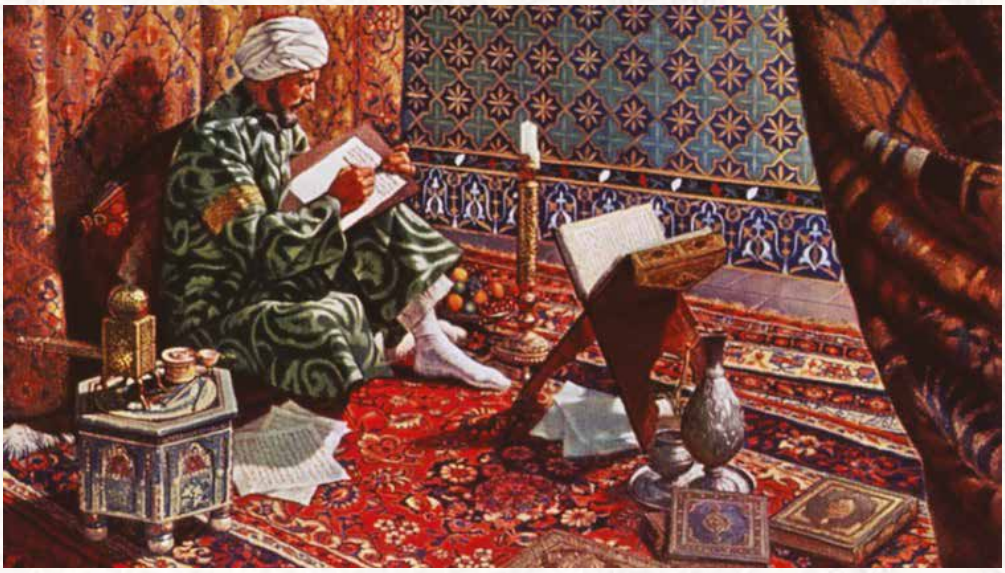

সর্ববিদ্যায় পারদর্শী চিকিৎসাবিজ্ঞানী, রসায়নবিদ, গণিতজ্ঞ, জ্যোতির্বিদ, ভূগোলবিদ, মৃত্তিকাবিজ্ঞানী, তর্কশাস্ত্রবিদ, সংগীতজ্ঞ, কবি এবং ইরান ও বিশ্বের অন্যতম প্রভাবশালী দার্শনিক ও পণ্ডিত আবু আলী হোসাইন বিন আবদুল্লাহ বিন হাসান বিন আলী বিন সিনা ৩৭০ হিজরির সফর মাসে (৯৮০ খ্রিস্টাব্দের আগস্ট মাস) তদানীন্তন পারস্যের বোখারায় জন্মগ্রহণ করেন। প্রাচ্যে তিনি আবু আলী সিনা, ইবনে সিনা, পুর সিনা প্রভৃতি নামে সুপ্রসিদ্ধ। দর্শন ও চিকিৎসাশাস্ত্রে বিশেষ অবদানের জন্য তাঁর খ্যাতি বিশ্বজোড়া। তাঁর সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য সৃষ্টি বিজ্ঞান ও দর্শনের জ্ঞানকোষ 'কিতাবে শেফা' এবং 'দানেশ নামেয়ে এলমি'। তাঁর বিখ্যাত গ্রন্থ 'কানুন ফিত তিব্ব'কে 'চিকিৎসাশাস্ত্রের বাইবেল' বলে আখ্যায়িত করা হয়।

ইবনে সিনার পিতা আবদুল্লাহ ছিলেন বালখের অধিবাসী। সামানিদের পতন ও সুলতান মাহমুদের উত্থান– এই সন্ধিক্ষণে তিনি মাওয়ারাউন্ নাহর-এর সামানি শাসক আমির নূহ বিন মানসুর (শাসনকাল ৯৭৬-৯৯৭ খ্রিস্টাব্দ)-এর শাসনকালে জন্মভূমি বালখ ত্যাগ করে বোখারা চলে আসেন এবং এক উচ্চপদে নিযুক্ত হন। কিছুদিন পর রাজস্ব বিভাগের একটি পদে নিযুক্ত করে তাঁকে খারামশীন-এ প্রেরণ করা হয়। এরই নিকটবর্তী আফশানে গ্রামের সেতারে নামক এক মেয়ের সাথে তিনি বিবাহবন্ধনে আবদ্ধ হন। এখানেই তাঁদের প্রথম সন্তান ভুবনবিজয়ী পণ্ডিত ও চিকিৎসাশাস্ত্রবিদ ইবনে সিনার জন্ম হয়।

ইবনে সিনা ছিলেন অত্যন্ত মেধাবী এবং প্রখর স্মৃতিশক্তির অধিকারী। ছয় বছর বয়সে তিনি পিতার সাথে বোখারায় চলে আসেন এবং এখানে তাঁর শিক্ষা শুরু হয়। দশ বছর বয়সে তিনি পবিত্র কুরআন মুখস্ত করেন। অতঃপর সাহিত্য অধ্যয়ন করেন এবং বিভিন্ন শিক্ষকের নিকট ফিক্‌হ বা মুসলিম আইনশাস্ত্র ও কালাম বা অলংকারশাস্ত্রে শিক্ষা লাভ করেন।

ইবনে সিনা আবদুল্লাহ নাতিলির নিকট নীতি-দর্শন, জ্যামিতি, জ্যোতিঃ বিজ্ঞান এবং মানতেক বা তর্কশাস্ত্রশিক্ষা করেন। নাতিলি ইবনে সিনার জ্ঞানান্বেষায় মুগ্ধ হয়ে তাঁর পিতাকে স্বীয় পুত্রকে জ্ঞান শিক্ষা দান ছাড়া অন্য কোনো কাজে নিযুক্ত না করার পরামর্শ দেন এবং ইবনে সিনাকেও বিদ্যার্জন ছাড়া অন্য কোনো কাজে যুক্ত না হবার উপদেশ দেন। ইবনে সিনাও ওস্তাদের উপদেশ মতো জ্ঞান শিক্ষায় নিজেকে সম্পূর্ণরূপে নিযুক্ত করেন এবং মানতেক বা তর্কশাস্ত্রে ওস্তাদের চেয়েও অধিকতর ব্যুৎপত্তি অর্জন করেন। অল্প দিনেই তিনি, মাত্র ১৪ বছর বয়সে, শিক্ষককে ছাড়িয়ে যান। নাতিলি বোখারা ছেড়ে চলে যাওয়ার পর ইবনে সিনা ধর্মতত্ত্ব ও প্রকৃতিবিজ্ঞান অধ্যয়নে মনোনিবেশ করেন। এর কিছুদিন পর তাঁর ভেতর চিকিৎসাবিজ্ঞান অধ্যয়নের আগ্রহ সৃষ্টি হয়। ইতঃপূর্বের চিকিৎসাবিজ্ঞানিগণ যা কিছু লিখেছিলেন তার সবই তিনি পড়ে শেষ করেন। চিকিৎসাবিজ্ঞান তাঁর কাছে তেমন কোনো জটিল শাস্ত্র ছিল না, তাই দ্রুততম সময়েই তিনি এই বিষয়ে ব্যুৎপত্তি অর্জন করেন এবং চিকিৎসাকার্যে অভিজ্ঞতা ও পর্যবেক্ষণের মাধ্যমে লব্ধ জ্ঞানের পরিপূর্ণতা সাধন করেন। যার ফলে তাঁর সমসাময়িক অন্যান্য চিকিৎসাবিজ্ঞানী এই বিদ্যা আয়ত্ত করার উদ্দেশ্যে তাঁর নিকট আগমন করেন। বলা হয়ে থাকে, 'যখন চিকিৎসাবিদ্যার অস্তিত্ব ছিল না তখন হিপোক্রেটিস এর সৃষ্টি করেন; যখন এটি প্রায় মরে গিয়েছিল তখন গ্যালেন একে পুনরুজ্জীবিত করেন; যখন এটি বিচ্ছিন্ন ও বিক্ষিপ্ত হয়ে পড়ে তখন আর-রাজি একে সুসংবদ্ধ করেন; তবে এটি ছিল অসম্পূর্ণ, ইবনে সিনা একে পরিপূর্ণতা দান করেন।' এসময় তিনি রুগীদের চিকিৎসার পাশাপাশি অন্যান্য শাস্ত্র যথা পদার্থবিদ্যা ও অধিবিদ্যা অধ্যয়ন করছিলেন। এ সময় তিনি খুব কম রাতই ঘুমিয়ে

কাটিয়েছেন এবং খুব কম দিনই কাটে যাতে তিনি অধ্যয়ন ব্যাতীত অন্য কোনো কাজ করেছেন। আঠারো বছর বয়স পর্যন্ত দিনরাত তিনি লেখাপড়ায়ই ব্যাপৃত থাকতেন। নিদ্রাকর্ষণ যাতে তাঁর অধ্যয়নে ব্যাঘাত না ঘটায় সে জন্য তিনি নিদ্রা-প্রতিরোধক কিছু পান করতেন। নিদ্রিত অবস্থায়ও তাঁর মনে নানা প্রশ্নের উদয় হতো, এমনকি কোনো কোনো প্রশ্নের সমাধান নিদ্রার মাধ্যমেই হয়ে যেত।

এ সময় তিনি ধর্মতত্ত্ব, বিশেষ করে স্রষ্টার পরিচয় বিষয়ে অধ্যয়নে অত্যন্ত আগ্রহী হয়ে পড়েন এবং অ্যারিস্টোটলের 'মা বাদাত্ তাবিয়ি' গ্রন্থ অধ্যয়ন করতে শুরু করেন। কিন্তু অ্যারিস্টোটলের ম্যাটাফিজিক্স-এর কিছুই তিনি বুঝতে পারেন না এবং এসব বক্তব্যের মাধ্যমে লেখক কী বলতে চাচ্ছেন তাও তাঁর নিকট সুস্পষ্ট হয় না। ফলে তিনি গ্রন্থটি আবার শুরু থেকে পাঠ করতে আরম্ভ করেন। এভাবে তিনি চল্লিশ বার গ্রন্থটি পাঠ করেন। যার ফলে গ্রন্থটি তাঁর মুখস্ত হয়ে যায়। তথাপি এর বক্তব্য তাঁর নিকট অস্পষ্টই থেকে যায়। অবশেষে একদিন বিকেলে তিনি বইয়ের বাজারের ভেতর দিয়ে যাচ্ছিলেন এমন সময় দেখেন ভ্রাম্যমাণ এক বই বিক্রেতা একটা বই হাতে করে ক্রেতা খুঁজছে। বিক্রেতা বইটি তাঁকে কেনার জন্য অনুরোধ করে। তিনিও বইটি কিনে নিয়ে আসেন। এটি ছিল আবু নাসর আল-ফারাবির 'এগরাজে মা বাদাত্ তাবিয়ি'। বাড়ি পৌঁছেই তিনি বইটি নিয়ে পড়তে বসে পড়েন এবং এটি পড়তে পড়তেই অ্যারিস্টোটলের 'মা বাদাত্ তাবিয়ি'র সব বক্তব্য তাঁর নিকট পরিষ্কার হয়ে যায়। কারণ, 'মা বাদাত্ তাবিয়ি'র প্রতিটি শব্দই হুবহু তাঁর মুখস্ত ছিল। এই ঘটনায় তিনি এতটাই আনন্দিত হন যে, পরদিন তিনি বহু অভাবী লোকদের দান-সদকা করেন। ঘটনাটি ঘটেছিল ৩৮৭ হিজরিতে। এসময় ইবনে সিনার বয়স ছিল ১৭ বছর।

ইবনে সিনার বয়স যখন ১৮ বছর তখন বোখারার শাসনকর্তা নূহ বিন মানসুর এক জটিল রোগে আক্রান্ত হন। বহু চিকিৎসক চিকিৎসা করে তাঁর রোগ নিরাময়ে ব্যর্থ হলে ইবনে সিনার ডাক পড়ে। কারণ, এরই মধ্যে ইবনে সিনার চিকিৎসার খ্যাতি চারদিকে ছড়িয়ে পড়েছিল। তাঁর চিকিৎসায় নূহ বিন মানসুর সুস্থ হয়ে ওঠেন। এতে খুশি হয়ে ইবনে সিনাকে তিনি তাঁর রাজকীয় গ্রন্থাগার ব্যবহারের সুযোগ দেন। এটি ছিল খুব সমৃদ্ধ একটি গ্রন্থাগার এবং শুধু শাহজাদাগণেরই এ গ্রন্থাগারে প্রবেশের অনুমতি ছিল। ইবনে সিনা এই গ্রন্থাগারে এমনসব দুর্লভ গ্রন্থাদি অধ্যয়নের সুযোগ পান সাধারণ মানুষ যেগুলোর নামই জানত না এবং ইবনে সিনারও ইতঃপূর্বে এগুলো দেখার সুযোগ ঘটেনি। এসব গ্রন্থ অধ্যয়নে ইবনে সিনার জ্ঞান-সাধনার প্রভূত উন্নতি সাধিত হয়।

সময় ভালোই যাচ্ছিল। কিন্তু এরই মধ্যে ইবনে সিনার পিতার ইন্তেকাল ঘটে। এর কিছুদিন পর বোখারার শাসক নূহ বিন মানসুরেরও মৃত্যু হয়। বোখারায় রাজনৈতিক গোলযোগ শুরু হয়। ফলে তিনি খাওয়ারিজমের গোরগাঞ্জ-এর উদ্দেশে বোখারা ত্যাগ করেন। ১০০১ খ্রিস্টাব্দে তিনি খাওয়ারিজম পৌঁছেন। খাওয়ারিজমের শাসনকর্তা আলী ইবনে মামুন তাঁকে সসম্মানে রাজ দরবারে বরণ করেন। এখানে তিনি বেশ কিছুদিন অবস্থান করেন। এখানে তাঁর আবু রায়হান আল বিরুনি, আবু নাসর আল ইরাকি, আবু সাঈদ আবুল খায়ের প্রমুখ পণ্ডিত ও সুফির সাথে সাক্ষাৎ ঘটে। আলী ইবনে মামুনের আনুকূল্যে খাওয়ারিজমে অবস্থানকালে তিনি বেশ ক'টি গ্রন্থ রচনা করেন। ইতঃপূর্বে বোখারায় অবস্থানকালেও তিনি বেশ ক'টি গ্রন্থ রচনা করেছিলেন।

এরই মধ্যে বিশ্বপরিস্থিতির পরিবর্তন ঘটে। ফলে ইবনে সিনা ১০১৩ খ্রিস্টাব্দে জুরজানের উদ্দেশে গোরগাঞ্জ ত্যাগ করতে বাধ্য হন। উদ্দেশ্য ছিল বন্ধু কাবুস বিন ওয়াশামগিরের সাথে সাক্ষাৎ করা। তিনি খোরাসানের পথে যাত্রা করেছিলেন। বেশ কিছুদিন এ-শহর, ও-শহর ঘোরাঘুরির পর অবশেষে জুরজানে পৌঁছেন। তবে এরই মধ্যে কাবুস বিন ওয়াশামগিরের মৃত্যু ঘটে। জুরজানে তিনি তাঁর এক বন্ধুর আতিথেয়তায় বেশ কিছুদিন অবস্থান করেন। জুরজানে অবস্থানকালে তিনি বেশ ক'টি গ্রন্থ রচনা করেন। এসময় আবু ওবায়েদ জুরজানি তাঁর শিষ্যত্ব গ্রহণ করেন। জীবনের শেষ পর্যন্ত আবু ওবায়েদ জুরজানি তাঁর সহচর ছিলেন।

১০১৫ খ্রিস্টাব্দে ইবনে সিনা জুরজান থেকে রেই গমন করেন। এখানে তিনি দিলমি বংশীয় শাসনকর্তা মাজদুদ্দৌলার খেদমতে উপস্থিত হন এবং চিকিৎসার মাধ্যমে তাঁকে বিষণ্ণতার জটিল রোগ থেকে সারিয়ে তোলেন। ইবনে সিনা রেই-এ অবস্থানকালেই ১০১৫ খ্রিস্টাব্দের এপ্রিল মাসে মাজদুদ্দৌলার ভাই আলে বুইয়ার শাসনকর্তা শামসুদ্দৌলা রেই আক্রমণ করে। এ সময় ইবনে সিনা কাজভিন গমন করেন এবং কাজভিন থেকে হামেদানে চলে যান। হামেদানে তিনি দীর্ঘদিন অবস্থান করেন। এখানে তিনি হামেদানের শাসনকর্তা শামসুদ্দৌলা দিলমির চিকিৎসা করেন এবং তাঁর অনুরোধে মন্ত্রিত্ব

গ্রহণ করেন। ১০২১ খ্রিস্টাব্দে শামসুদ্দৌলার মৃত্যু পর্যন্ত তিনি এই পদে বহাল ছিলেন।এই সময়েই তিনি তাঁর বিখ্যাত গ্রন্থ 'কানুন' রচনা করেন এবং 'শিফা' গ্রন্থের রচনা শুরু করেন। ইবনে সিনার সুযোগ্য মন্ত্রিত্বের কারণে শামসুদ্দৌলার শাসনকাল ইতিহাসে প্রশংসিত স্থান লাভ করেছে।

শামসুদ্দৌলার মৃত্যুর পর স্বীয় পুত্র সামাউদ্দৌলা তাঁর স্থলাভিষিক্ত হন এবং তিনি ইবনে সিনাকে তাঁর মন্ত্রিত্বের পদ অব্যাহত রাখার অনুরোধ করেন। কিন্তু ইবনে সিনা রাজকার্যে পূর্ব থেকেই সন্তুষ্টি বোধ করছিলেন না, এই পদ থেকে মুক্তির বাহানা অনুসন্ধান করছিলেন। তাই তিনি গোপনে ইসফাহানের শাসনকর্তা আলাউদ্দৌলা আলে কাকুইয়ার সাথে পত্রযোগাযোগ করেন।

ইবনে সিনা সামাউদ্দৌলার মন্ত্রিত্ব গ্রহণ করতে অসম্মতি জানালে তাঁর বিরুদ্ধে অভিযোগ আনা হয় যে, ইসফাহানের শাসনকর্তার সাথে তাঁর পত্রযোগাযোগ রয়েছে এবং এই অভিযোগে তাঁকে গ্রেফতার করা হয়। ৪ মাস তিনি কারারুদ্ধ অবস্থায় কাটান এবং এ সময় তিনি ৩টি গ্রন্থ রচনা করেন। কারামুক্তির পর ইবনে সিনা কিছুদিন হামেদানে অবস্থান করেন। অতঃপর একদল দরবেশের সাথে গোপনে হামেদান থেকে বেরিয়ে পড়েন এবং ইসফাহান অভিমুখে যাত্রা করেন। এ সময় তাঁর ভাই, শিষ্য ওবায়েদ জুরজানি এবং আরো দুজন ব্যক্তি তাঁর সফরসঙ্গী ছিলেন। বহু বন্ধুর পথ পাড়ি দিয়ে অবশেষে তাঁরা ইসফাহান গিয়ে পৌছেন। ইসফাহানের শাসনকর্তা আলাউদ্দৌলা তাঁকে উষ্ণ অভ্যর্থনার মাধ্যমে গ্রহণ করেন। আলাউদ্দৌলা ছিলেন মুক্ত চিন্তা ও জ্ঞানী পণ্ডিতদের পৃষ্ঠপোষক। যুদ্ধ কিংবা শান্তিকালে, সফর কিংবা রাজধানীতে অবস্থানকালে সর্বদাই তিনি ইবনে সিনাকে তাঁর সাথে রাখতেন। এই শহরে অবস্থানকালেই ইবনে সিনা তাঁর বিখ্যাত গ্রন্থ 'কিতাবুশ শেফা' রচনা সমাপ্ত করেন। ১০৩৭ খ্রিস্টাব্দে তিনি যখন আলাউদ্দৌলার সাথে হামেদান সফরে যান এসময় তিনি গুরুতর অসুস্থ হয়ে পড়েন। ৪২৮ হিজরির ৪ রমজান মোতাবেক ১০৩৭ খ্রিস্টাব্দের ২১ জুন এই শহরেই তিনি ইন্তেকাল করেন এবং এখানেই তাঁকে সমাহিত করা হয়।

যদিও অল্প বয়সেই ইবনে সিনা জ্ঞান-বিজ্ঞানের বিভিন্ন বিষয়ে গ্রন্থ রচনা শুরু করেছিলেন তবে জুরজান, হামেদান এবং ইসফাহানের শাহী দরবারের পৃষ্ঠপোষকতায়ই তাঁর রচনাশক্তি পূর্ণ পরিণতি পায়। রাজ-মন্ত্রিত্ব গ্রহণের পর যখন তাঁর কর্মব্যস্ত জীবন শুরু হয় তখনো তিনি ভ্রমণ ও প্রবাস অবস্থায়ও নিজের বৃহৎ গ্রন্থসমূহের সারসংক্ষেপ ও বিভিন্ন প্রবন্ধ রচনায় নিবিষ্ট থাকতেন। ফলে তাঁর বিশাল এক রচনাসম্ভার তৈরি হয়। জ্ঞান-বিজ্ঞানের বিভিন্ন বিষয়ে রচিত তাঁর এসব গ্রন্থের সংখ্যা ৪৫০-এরও অধিক। তবে এগুলোর বেশিরভাগই চিকিৎসা ও দর্শনবিষয়ক। জর্জ সার্টন তাঁর History of Science-গ্রন্থে ইবনে সিনাকে চিকিৎসাশাস্ত্রের একজন পণ্ডিত বলে আখ্যায়িত করেছেন। তিনি তাঁকে তাঁর সমসাময়িককালের ইরানের শ্রেষ্ঠ পণ্ডিত হিসেবে আখ্যায়িত করেছেন। একই সাথে তাঁকে সর্বযুগের, সর্বস্থানের এবং সর্বজাতির শ্রেষ্ঠ পণ্ডিতদের একজন বলে আখ্যায়িত করেছেন।

ইবনে সিনার সমকালে ইরানের পণ্ডিতদের বেশিরভাগই তাঁদের মাতৃভাষা ফারসি হওয়া সত্ত্বেও আরবি ভাষায়ই জ্ঞানচর্চা ও গ্রন্থ রচনা করতেন। ইবনে সিনাও তাঁর বেশিরভাগ গ্রন্থই আরবি ভাষায়ই রচনা করেছেন। পরবর্তীকালে কেউ কেউ এগুলো ফারসি ও অন্যান্য ভাষায় অনুবাদ করেছেন। দর্শন, ন্যায়শাস্ত্র ও অধিবিদ্যাবিষয়ক তাঁর গ্রন্থ 'আশ-শিফা' অল্প বয়সের রচনা হলেও বেশ ব্যাপক। এটি কয়েকটি খণ্ডে মুদ্রিত হয়েছে। চিকিৎসাবিজ্ঞান বিষয়ে তাঁর সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য গ্রন্থ 'আল-কানুন ফিত্ তিব' বা সংক্ষেপে 'আল কানুন'। 'কানুন' চিকিৎসাবজ্ঞানের একটি বৃহৎ, ব্যাপক ও উচ্চ মর্যাদাসম্পন্ন রচনা। আবদুর রহমান শারাফকান্দি 'কানুন ফিত তিব্ব' ফারসি ভাষায় অনুবাদ করেন। এটি ইউরোপেরও বিভিন্ন ভাষায় অনূদিত হয়। এ গ্রন্থে ইবনে সিনা প্রাচীনকাল ও তাঁর সমসাময়িককালের চিকিৎসাবিজ্ঞান বিষয়ে লব্ধজ্ঞান অত্যন্ত পরিশ্রমের সাথে সুবিন্যস্ত আকারে লিপিবদ্ধ করেছেন। এ কারণেই এ গ্রন্থ প্রকাশের পর চিকিৎসাবিজ্ঞান বিষয়ে গ্যালেন, রাজি ও আলী ইবনে আব্বাসের রচনাবলির ব্যবহার পরিত্যাক্ত হয়।

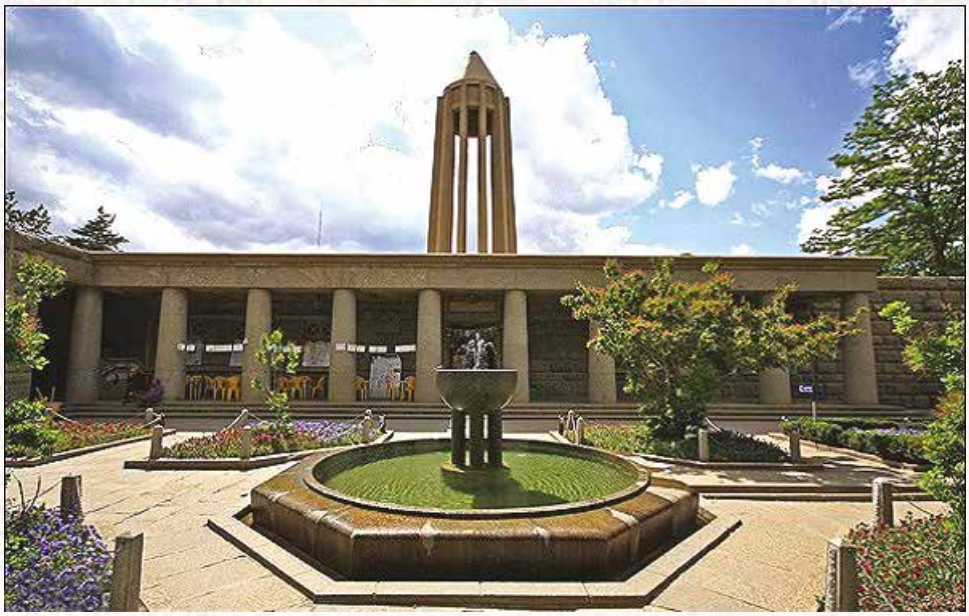

ইবনে সিনার সমকালেই জ্ঞান-বিজ্ঞানে তাঁর খ্যাতি এশিয়া থেকে ইউরোপেও পৌঁছে গিয়েছিল। চিকিৎসাবিজ্ঞান বিষয়ক ইবনে সিনার দুটি মৌলিক গ্রন্থ 'শেফা' এবং 'কানুন' দ্বাদশ শতকেই ইউরোপে চিকিৎসাশাস্ত্রের মৌলিক বিদ্যা হিসেবে অধীত হতো। দ্বাদশ শতক থেকে ষোড়শ শতক পর্যন্ত প্রাচ্য ও পাশ্চাত্যের সর্বত্রই চিকিৎসাবিজ্ঞানের তাত্ত্বিক ও প্রায়োগিক অধ্যাপনার বিষয়গুলো মূলত ইবনে সিনার 'শেফা' এবং 'কানুন'-এর ভিত্তিতেই পরিচালিত হতো। অবশ্য ইউরোপীয়রা আবুবকর মোহাম্মদ বিন যাকারিয়া রাজির চিকিৎসাবিষয়ক তত্ত্ব সম্পর্কেও অবহিত ছিল। তবে ইউরোপে তিনি চিকিৎসা-তাত্ত্বিকের চেয়ে চিকিৎসক হিসেবেই অধিকতর গণ্য হতেন। কিন্তু চিকিৎসাবিজ্ঞানের শিক্ষার্থীদের কাছে ইবনে সিনার 'কানুন' বিকল্পহীন গ্রন্থ হিসেবে বিবেচিত হতো। যদিও গ্যালেনের মাধ্যমে প্রাচীন চিকিৎসা পদ্ধতির চরম উন্নতি হয়েছিল তবে ইবনে সিনা গ্যালেনকেও ছাড়িয়ে গিয়েছিলেন। 'কানুন' গ্রন্থে খুঁটিনাটি বিষয়ের আলোচনায় ইবনে সিনা যে সূক্ষ্ম দৃষ্টির পরিচয় দিয়েছেন তার অনুমান এ থেকেই করা যায় যে, তিনি বেদনার পনেরোটি কারণ বর্ণনা করেছেন। চোখের আবরণের প্রদাহ বর্ণনায় তিনি মধ্যস্থিত এবং পার্শ্বস্থ আবরণের মধ্যে পার্থক্য নির্দেশ করেছেন। এ গ্রন্থে তিনি বলেন, ক্ষয়রোগ একটি সংক্রামক ব্যাধি এবং এই রোগের বিস্তারে বাতাস ও পানির প্রভাব অনেক বেশি। চর্মরোগের যথাযথ বর্ণনা দেওয়া ছাড়াও তিনি ধাতুগত পীড়া ও ধাতুগত বিকৃতি, স্নায়বিক উপসর্গ, এমনকি প্রেমজনিত পীড়া সম্পর্কেও বিশদ আলোচনা করেছেন। তিনি মানসিক ও পীড়াগত তথ্যের নিদান নিরূপণ ও এর বিশ্লেষণও করেছেন। এখান থেকেই মনোবিশ্লেষণ (Psycho-analysis) শুরু হয়। ভেষজ দ্রব্যগুণ বিষয়ে তিনি অষুধসমূহের যথার্থ তত্ত্ব ও ভেষজবিদ্যায় অনুসরণীয় পদ্ধতিসমূহের একটা নক্সাও প্রস্তুত করেছেন।

১১৫০ থেকে ১১৮৭ খ্রিস্টাব্দের মধ্যে জারারদ কারমুনায়ি 'কানুন'-এর সম্পূর্ণ অনুবাদ করেন। ইউরোপে এটি Cannon medicina নামে প্রসিদ্ধ। এ পর্যন্ত এটি প্রায় ৮৭টি ভাষায় অনূদিত হয়েছে। এসব অনুবাদের বেশিরভাগই ল্যাটিন ভাষায়। তবে স্পেনিস, ইতালীয় এবং দক্ষিণ ফরাসি ভাষায়ও কিছু অনুবাদ হয়েছে। ইউরোপের প্রায় সব বিশ্ববিদ্যালয়েই চিকিৎসাবিজ্ঞান শিক্ষার মূল ভিত্তিই ছিল ইবনে সিনার 'কানুন ফিত্ তিব'। এ পর্যন্ত ইউরোপের চিকিৎসা বিদ্যালয়গুলোর সবচেয়ে পুরোনো যে পাঠ্যক্রমের সন্ধান পাওয়া গেছে, যেটি ১৩০৯ খ্রিস্টাব্দে পঞ্চম পোপ কালমান্ট-এর মাধ্যমে মনোপলিয়ে চিকিৎসা বিদ্যালয়ের জন্য প্রণীত হয়েছিল, তাতে ইবনে সিনার 'কানুন' গ্রন্থের নাম উল্লেখ পাওয়া যায়। পরবর্তীতে ১৫৫৭ খ্রিস্টাব্দ পর্যন্ত সব পাঠ্যক্রমেই এ গ্রন্থের উল্লেখ পাওয়া যায়। এর দশ বছর পর অর্থাৎ ১৫৬৭ খ্রিস্টাব্দে বিখ্যাত গ্রীক চিকিৎসাশাস্ত্রবিদ গ্যালেনাস-এর নাম ইবনে সিনার চেয়ে অধিক প্রাধান্য পায়। তবে সপ্তদশ শতক পর্যন্তই ইবনে সিনার 'কানুন' ইউরোপে পাঠ্যভুক্ত ছিল।

জর্জ সার্টন-এর মতে, ইবনে সিনা ছিলেন বিশ্বের শ্রেষ্ঠ দার্শনিকদের একজন। তেনসি বিশ্ববিদ্যালয়ের দর্শন বিশ্বকোষে ইবনে সিনাকে প্রাক-আধুনিক যুগের সবচেয়ে প্রভাবশালী দার্শনিক হিসেবে উল্লেখ করা হয়েছে। তাঁর দর্শনবিষয়ক বক্তব্যসমূহ পরবর্তী যুগের বিখ্যাত দার্শনিকবৃন্দ, যথা : মোল্লা সাদরা, টমাস অকুইয়ুনাস, ডেকার্ট প্রমুখের ওপর প্রভাব ফেলেছিল। যদিও ইবনে সিনা অ্যারিস্টোটলীয় দর্শনের অনুসারী ছিলেন এবং এ দিক থেকে আল ফারাবি ছিলেন তাঁর এই চিন্তার গুরু। দর্শন বিষয়ে তাঁর আলোচনা-পর্যালোচনার বেশিরভাগই অ্যারিস্টোটলীয় ব্যাখ্যাকারদের মতামতের ভিত্তিতেই লক্ষ করা যায়। অ্যারিস্টোটলের ন্যায় তাঁর সমুদয় রচনার প্রারম্ভও হয়েছে ন্যায়শাস্ত্র হতেই। তবে যতই দিন গড়াতে থাকে তিনি অ্যারিস্টোটলীয় দর্শন-চিন্তা থেকে দূরে সরে যেতে থাকেন এবং প্লেটনিক ও ইসলামের আধ্যাত্মিক দর্শন-চিন্তায় প্রভাবিত হতে থাকেন। তাঁর বিশাল আকারের গ্রন্থ 'মান্তেকুল মাশরেক্বিন'-এর বক্তব্যসমূহ এর প্রকৃষ্ট দৃষ্টান্ত, যেটি তিনি জীবনের শেষ দিকে রচনা করেছিলেন। কিন্তু আফসোসের বিষয় হচ্ছে বর্তমানে এই গ্রন্থটির ভূমিকা অংশ ছাড়া আর কিছুই অবশিষ্ট নেই।

ইবরাহিম মাকদুর মনে করেন, দর্শনে ইবনে সিনা অ্যারিস্টোটল অপেক্ষা অধিকতর অগ্রসর হয়েছেন। তাঁর দর্শন এক হিসেবে নতুন ন্যায়ের অগ্রদূত। সে কারণেই মুসলিম বিশ্বে 'সিনুভি দর্শনতত্ত্ব' বা 'ইবনে সিনার দর্শনতত্ত্ব' নামে পৃথক দর্শনতত্ত্বের সৃষ্টি হয়। পরবর্তীতে ইউরোপীয় দর্শনশাস্ত্রেও ইবনে সিনার দর্শনতত্ত্ব স্বীকৃতি পায়। খাজা নাসির উদ্দিন তুসির 'বিমূর্তন বিশ্বাসতত্ত্ব' মূলত ইবনে

সিনার দর্শনতত্ত্ব থেকেই উদ্ভুত। ইবনে সিনার মতে, মানতিক বা ন্যায়শাস্ত্র হচ্ছে একটি চিন্তামূলক শিল্প। এর কাজ হচ্ছে দার্শনিককে সঠিক সীমা ও সঠিক ধারণা পর্যন্ত পৌঁছে দেওয়া। কারণ, যে কোনো প্রকারের জ্ঞানই হোক না কেন, হয় তা হবে 'তাসাব্বুর' বা নিছক ধারণা অথবা হবে 'তাসদিক্ব' বা সত্যতা প্রতিপাদন। 'তাসদিক্ব'-এর মাধ্যম হলো 'ক্বিয়াস' বা অনুমান। এটি সঠিকও হতে পারে, আবার বেঠিকও হতে পারে। এ ক্ষেত্রে প্রয়োজনীয় বিষয় হচ্ছে শব্দসমূহের তাৎপর্য নির্ণয়। এ কারণে তিনি সম্বোধনমূলক, বিতর্কমূলক, বিভ্রান্তিমূলক ও কুতর্কমূলক প্রমাণ প্রয়োগ পদ্ধতিসমূহরে ব্যাখ্যা প্রসঙ্গে শব্দসমূহকে 'মুফরাদ' বা মৌল এবং 'মুরাক্কাব' বা যৌগ এই দুই শ্রেণিতে বিভক্ত করেছেন।

সত্তা (Being) ও অস্তিত্ব (Existence) প্রশ্নে ইবনে সিনার অনুরাগ বিশেষ প্রকট। তাঁর মতে সত্তার মৌলিক পরিচয় এর নিজ অস্তিত্ব হতেই প্রতিষ্ঠিত। সত্তার বর্ণনায় কেবল এইটুকু বলাই যথেষ্ট নয় যে, এর নিজ অস্তিত্ব থেকে এটি ভিন্ন নয় অথবা এর অস্তিত্বের সাথে সম্পর্কহীন নয়। এই সম্পর্কহীনতা কল্পনাই করা যায় না। উদাহরণস্বরূপ বলা যায়, ত্রিভুজের তিনটি কোণের সমষ্টি দুই সমকোণের সমান, এই কথাটি বাস্তবেও সত্য এবং কল্পনাতেও সত্য। সুতরাং ত্রিভুজ হতে এ কথাটিকে বিচ্ছিন্ন করা হলে ত্রিভুজ সম্পর্কে এটি বলা সম্ভব হবে যে, এটি সত্তাজ্ঞাপক ও অস্তিত্বজ্ঞাপক উভয়ই।

ইবনে সিনা বিজ্ঞান ও দর্শনচর্চার পাশাপাশি সাহিত্যচর্চাও করেছেন। আরবি ও ফারসি ভাষায় তাঁর বেশ কিছু কবিতা রয়েছে। বিভিন্ন জীবনীগ্রন্থে ৭২টি ফারসি শের (শ্লোক) ইবনে সিনার রচনা হিসেবে উদ্ধৃত করা হয়েছে। এসব কবিতায় সৃষ্টিজগতের নশ্বরতা ও মানব জাতির অক্ষমতা সম্পর্কে ইবনে সিনার তীর্যক ব্যঙ্গ লক্ষ করা যায়। নমুনা হিসেবে কয়েকটি পঙ্‌ক্তির উদ্ধৃতি করা যায় :

بر سرِ خاک باد پیمودم
روزکی چند در جهان بودم
جانِ پاکیزه را بیالودم
ساعتی لطف و لحظه‌ای در قهر
بی‌خرد را به طمع بستودم
باخرد را به طبع، کردم هَجو
و آبِ دیده ازو بیالودم
آتشی برافروختم از دل

[বাতাসের ধূলির মাথায় করেছি ভ্রমণ
যতদিন ছিলাম এই ভুবন
পরিচ্ছন্ন জীবনকে করেছি দূষণ
ক্রোধের ভেতর করুণার সময়-ক্ষণ
লিপ্সায় করেছি মূর্খের তোষণ
জ্ঞানীকে করেছি দুর্নামে মুদ্রণ
আর তার অশ্রুজলে করেছি মিশ্রণ
হৃদয়ে জ্বেলেছি অগ্নি-দহন]

ইবনে সিনা জ্ঞানচর্চা ও গ্রন্থ রচনার পাশাপাশি আবু ওবায়েদ জুরজানি, আবুল হাসান বাহামানিয়ার, আবু মানসুর তাহের ইসফাহানি, আবু আবদুল্লাহ মোহাম্মদ বিন আহমাদ আল মাসুমি প্রমুখের ন্যায় বেশ কিছু যোগ্য চৈন্তিক উত্তরসূরিও তৈরি করেছিলেন। যাঁরা প্রত্যেকেই ছিলেন বিজ্ঞ পণ্ডিত এবং নিজ নিজ ক্ষেত্রে পাণ্ডিতের কারণে সমকালেই খ্যাতি অর্জন করেছিলেন।

ইবনে সিনাকে স্মরণীয় করে রাখার উদ্দেশ্যে ইরানে ইবনে সিনার জন্মদিন ২৩ আগস্ট 'চিকিৎসক দিবস' হিসেবে পালিত হয়। এ ছাড়া বিজ্ঞান, দর্শন ও জ্যোতির্বিজ্ঞানে তাঁর অনবদ্য অবদানের স্বীকৃতি হিসেবে পৃথিবীর বিভিন্ন দেশে ইবনে সিনার নামে নানা প্রতিষ্ঠান এবং সংগঠনের নামকরণ করা হয়েছে। 'ইবনে সিনা মুখ' নামে চাঁদের লুক্কায়িত দিকের একটি মুখের নামকরণ করা হয়েছে। তেহরান, শিরাজ, মাশহাদ, ইসফাহান, ইস্তাম্বুল, হারারে, ফ্রান্সের বুবিনি এবং বাংলাদেশের ঢাকায় ইবনে সিনার নামে হাসপাতাল ও মেডিক্যাল কলেজের নামকরণ করা হয়েছে। নিউইয়র্কে ইবনে সিনার নামে একটি অপারেশন থিয়েটারের নামকরণ করা হয়েছে। পূর্ব ব্রিটেনের সাসেক্সে ইবনে সিনার নামে একটি চাইনিজ মেডিক্যাল কলেজের নামকরণ করা হয়েছে। পাকিস্তানেও ইবনে সিনার নামে একটি মেডিক্যাল কলেজ প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। হাঙ্গেরীতে ইবনে সিনার নামে একটি ইন্টারন্যাশনাল মেডিক্যাল কলেজ রয়েছে। তেহরানে ইবনে সিনার নামে আন্তর্জাতিক বায়োটেকনোলজি জার্নাল প্রকাশিত হচ্ছে। তেহরানে ইবনে সিনা নামে একটি গবেষণাকেন্দ্রও রয়েছে। এ ছাড়া ইবনে সিনা নামে বেশ কটি স্কুল এবং শিক্ষাকেন্দ্রও কাজ করছে।

জার্মানিতে ইবনে সিনার নামে একটি পুরস্কারও প্রবর্তিত হয়েছে। ২০০৫ খ্রিস্টাব্দে ড. ইয়াশার বিলগিন আরো কজন বিজ্ঞজনকে সাথে নিয়ে ফ্রাঙ্কফুর্ট শহরে 'অভিসিনা প্রেইজ' (Avicenna-Preis e. V) নামে একটি জনহিতকর সংগঠন প্রতিষ্ঠা করেন। এই সংগঠন প্রতিবছর বিভিন্ন জাতি-গোষ্ঠীর মধ্যে পারস্পরিক সাংস্কৃতিক সুসম্পর্ক প্রতিষ্ঠায় বিশেষ অবদানের জন্য মূল্যায়নের ভিত্তিতে কোনো ব্যক্তি বা সংস্থাকে 'ইবনে সিনা পুরস্কার' প্রদান করে। এই পুরস্কারের মূল্যমান এক লক্ষ ইউরো।

২০০৯ খ্রিস্টাব্দের জুন মাসে ইসলামি প্রজাতন্ত্র ইরান বিজ্ঞানের শান্তিপূর্ণ অগ্রগতির নিদর্শনস্বরূপ ভিয়েনায় অবস্থিত জাতিসংঘের দপ্তরে হাখামানশি যুগের স্থাপত্যধারা এবং ইসলামি স্থাপত্যধারার মিশেলে প্রস্তুত একটি চমৎকার ভাস্কর্য উপহার দেয়, যেটি এই দপ্তরের মূল প্রবেশদ্বারের ডানপাশে স্থাপন করা হয়েছে। চারদিক-সম্মুখবিশিষ্ট এই ভাস্কর্যে ইরানের বিখ্যাত চার দার্শনিক ওমর খাইয়াম, আবু রায়হান বিরুনি, যাকারিয়া রাজি এবং ইবনে সিনার প্রতিকৃতি বিদ্যমান।

লেখক : অধ্যাপক, ফারসি ভাষা ও সাহিত্য বিভাগ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়।